কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সূচী

কৃষ্ণকলি
ইত্যাদি
গল্প

পরশুরামের লেখা
অন্যান্য গল্পের বই :

গড্ডলিকা—২৷৷০
কজ্জলী—২৷৷০
হনুমানের স্বপ্ন—২৷৷০
গল্পকল্প—২৷৷০
ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প—৩৲
নীল তারা ইত্যাদি গল্প—৩৲

কৃষ্ণকলি

সকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছি। রাস্তার ধারে একটা ফুলুরির দোকানের দাওয়ায় তিন-চার বছরের দুটি মেয়ে বসে আছে। একটি মেয়ে কুচকুচে কালো, কিন্তু সুশ্রী। আর একটি শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী মাঝারি রকম। দুজনে আমসত্ত্ব চুষছে।

আমি তাকাচ্ছি দেখে তারা মুখ থেকে আমসত্ত্ব বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরলে। বোধ হয় লোভ দেখাবার জন্য। বললুম, কি চুষছ খুকী?

কালো মেয়েটি উত্তর দিলে, বল দিকি নি কি?

—চটি জুতোর সুকতলা।

—হি হি হি, এ বাবুটা কিচ্ছু জানে না, আমসত্ত্বকে বলছে সুকতলা!

অন্য মেয়েটি বললে, হি হি হি, বোকা বাবু রে!

তার পর প্রায় চার বৎসর কেটে গেছে। সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরুবার উপক্রম করছি, একটি মেয়ে এসে বললে, একটু দুব্বো দেবে গা দাদু? বিশকম্মা পুজো হবে।

দেখেই চিনেছি এ সেই আমসত্ত্ব-চোষা কালো মেয়ে, এখন এর বয়স বোধ হয় আট বছর। বললুম, যত খুশি দুব্বো নাও না।

কৃষ্ণকলি

মেয়েটির সাজ দেখবার মত। সদ্য স্নান করে এসেছে, এলো চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। একটি ফরসা লালপেড়ে শাড়ি কোমরে জড়িয়েছে। গা খোলা, কিন্তু আঁচলের এক দিক মাথায় দেবার চেষ্টা করছে আর বার বার তা খসে পড়ছে। গোল গোল দুই হাত যেন কষ্টি পাথরে কোঁদা, তাতে ঝকঝকে রুপোর চুড়ি আর অনন্ত, কোমরে রুপোর গোট, গলায় লাল পলার মালা, পায়ে আলতা, হাতে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর। জিজ্ঞাসা করলুম, একি খুকী, বিয়ে করলে কবে?

মাথার ওপর কাপড় টেনে খুকী বললে, খুকী ব'লো নি বাবু, এখন বড় হইছি। আমার নাম কেলিন্দী।

আমি বললুম, কেলিন্দী নয়, কালিন্দী। কিন্তু তোমার আরও ভাল নাম আছে, কৃষ্ণকলি। রবি ঠাকুর তোমাকে দেখে লিখেছেন—কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।...কালো? তা সে যতই কালো হ'ক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ। কৃষ্ণকলি নাম তোমার পছন্দ হয়?

কালিন্দী ঘাড় দুলিয়ে জানালে যে খুব পছন্দ হয়।

—তোমার বিয়ে হল কবে?

—সেই অঘ্রান মাসে।

—শ্বশুরবাড়ি কোথায়? বরের নাম কি?

—ধেৎ, বরের নাম বুঝি বলতে আছে! শ্বশুরঘর হুই হোথাকে, ছুতোর-বউ মুড়িউলীর দোকানে। দাদু, ওই রাঙা ফুল দুটো দাও না, মা পুজো করবে।

কৃষ্ণকলি

চাকরকে বললুম, নিতাই, গোটাকতক রঙ্গন ফুল পেড়ে দাও।

মুখ বেঁকিয়ে সাদা দাঁত বার করে কৃষ্ণকলি বললে, এ ম্যা গে, ও তো নোংরা, পেন্টু পরে আছে, সাত জম্ম কাচে নি। তুমি ফুল পেড়ে দাও।

— আমিও তো নোংরা, এখনও স্নান করি নি, কাপড় ছাড়ি নি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, নিতাই তোমাকে আলগোছে তুলে ধরুক, ও ফুল ছোঁবে না, তুমি নিজের হাতে পেড়ে নাও।

—কি বলছ গা দাদু, আমার যে বে হয়ে গেছে!

বুঝলুম, পরপুরুষের স্পর্শে কৃষ্ণকলির আপত্তি আছে। বললুম, তবে তোমার বরকে ডেকে আন, সেই তোমাকে তুলে ধরুক।

—সে তুলতে লারবেক। তুমিই আমাকে তুলে ধর না, আমি ফুল পেড়ে নেব।

—সেকি কৃষ্ণকলি, তোমার যে বিয়ে হয়ে গেছে, আমি তোমাকে তুলে ধরব কি করে?

—তুমি তো বুড়ো থুবড়ো।

ঠিক কথা, এতক্ষণ আমার হুঁশ ছিল না যে আমি বুড়ো থুবড়ো, সমস্ত অবলাজাতি আমার কাছে অভয় পেয়েছে। বললুম, আমার হাতে যে বাতের ব্যথা, তোমাকে তোলবার তো শক্তি নেই।

—বাড়িতে আঁকশি নেই?

আমার লাঠির ডগায় একটা ছুরি বেঁধে আঁকশি করা হল। নিতাই তাই দিয়ে গোটাকতক ফুল পাড়লে, কৃষ্ণকলি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলে।

ফুল-দুব্বো নিয়ে সে চলে যাবার উপক্রম করছে, আমি তাকে বললুম, কৃষ্ণকলি, বিস্কুট খাবে?

—উঁহু।

—মাখন দেওয়া পাঁউরুটি আর মিষ্টি কুলের আচার?

কৃষ্ণকলির মুখ দেখে মনে হল তার রুচি আছে কিন্তু সংস্কারে বাধছে। বললে, আজ খেতে নেই, বিশকম্মা পুজো। সোঁসা আছে?

—আছে বোধ হয়। নিতাই, দেখ তো বাড়িতে শসা আছে কিনা।

শসা পবিত্র ফল, তাতে কৃষ্ণকলির আপত্তি নেই। নিতাই দুটো শসা এনে আলগোছে তার আঁচলে দিলে। আমি বললুম, কৃষ্ণকলি, তুমি এই অল্প বয়সে বিয়ে করে ফেলেছ, টের পেলে পুলিসে যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

—ইশ, নিয়ে গেলেই হল কিনা! আমি তো বে করি নি, বে করেছে রেমো। সেই তো মন্তর পড়লে, আমি চুপটি করে বসেছিনু। রেমোর বাবার গায়ে খুব জোর, বলেছে পুলিস এলে ভোমর ঘুরিয়ে তাদের পেট ছেঁদা করে দেবে।

—রেমো বুঝি তোমার বর?

কৃষ্ণকলি ওপর নীচে মাথা নাড়লে।

—এই যাঃ, কৃষ্ণকলি, বরের নাম করে ফেললে!

কৃষ্ণকলি লজ্জায় মা-কালীর মতন জিব বার করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, বলে ফেলেছ তা হয়েছে কি, আজকাল সব্বাই বরকে নাম ধরে ডাকে।

—সক্কলের সামনে ডাকে?

—আড়ালে ডাকে। নির্মলচন্দ্রের বউ ডাকে—ওরে নিমে, জগদানন্দর বউ ডাকে—এই জগা। দিন কতক পরে মেমদের মতন সক্কলের সামনেই ডাকবে।

—আমি যে তোমার সামনে বলে ফেললু!

—তাতে দোষ হয় নি, আমি বুড়ো লোক কিনা।

এমন সময় একটি ফ্রক-পরা মেয়ে এসে বললে, এই কেলিন্দী, কি করছিস এখেনে, এক্ষুনি আয়, মামী ডাকছে।

এই মেয়েটিই বোধ হয় সেই চার বছর আগে দেখা আমসত্ত্ব-চোষা দ্বিতীয় মেয়ে। কৃষ্ণকলি তাকে বললে, খবরদার বিমলি, আর কেলিন্দী কইবি নি, রবি ঠাকুর আমার ভাল নাম দিয়েছে কেষ্টকলি। এই দাদু বললে।

মুখভঙ্গী করে দু হাত নেড়ে বিমলি বললে, মরি মরি, কেলোকিষ্টি কেলিন্দীর নাম আবার কেষ্টকলি! রূপ দেখে আর বাঁচি নে!

কৃষ্ণকলি বললে, দেখ না দাদু, বিমলি আমায় ভেংচি কাটছে!

প্রশ্ন করলুম, বিমলি তোমার কে হয়, বোন নাকি?

—বোন না ঢেঁকি, ও তো আমার পিসতুতো ননদ। বিমলি, তুই যা, আমি একটু পরে যাব।

চলে যেতে যেতে বিমলি বললে, দেখিস এখন, আজ মামী তোকে ছেঁচবে। ওরে আমার কেষ্টকলি, শ্যাওড়া গাছের পেতনী!

কৃষ্ণকলি বললে, দাদু, ও আমায় পেতনী বলবে কেন?

—বলুক গে, ননদরা অমন বলে থাকে, শ্রীরাধার ননদও বলত। এক মেয়ের রূপ আর এক মেয়ে দেখতে পারে না। তোমার বর রেমো তো তোমাকে পেতনী বলে না?

—সেও বলে।

—তুমি রাগ কর না?

—উঁহু, সে হাসতে হাসতে বলে কিনা। আমিও তাকে বলি ভূত পিচেশ হনুমান।

—তোমরা ঝগড়া কর নাকি?

—আমি খুব ঝগড়া করি, চিমটিও কাটি, কিন্তু রেমো রাগে না, শুধু মুখ ভেংচায় আর হাসে।

এমন সময় রামের মা এল। সে অনেক দিন থেকে এ বাড়িতে মুড়ি চিঁড়েভাজা দিয়ে আসছে। তার স্বামী মুরারি ছুতোর মিস্ত্রী, ভাল কারিগর, কাঠের ওপর নকশা তোলে। রামের মা কৃষ্ণকলিকে দেখে বললে, ওমা, তুই এখেনে রইছিস, বিমলি যে বললে কেলিন্দী ধিঙ্গী হয়ে হেথা হোথা সেথা চাদ্দিক ঘুরে বেড়াচ্ছে!

কৃষ্ণকলি বললে, সব মিছে কথা। জান গা মা, এই দাদু বললে রবি ঠাকুর আমার নাম দিয়েছে কেষ্টকলি।

আমি রামের মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এ মেয়েটি তোমার বউ নাকি?

—হেঁ গা বাবা, গেল অঘ্রানে রেমোর সঙ্গে বে দিয়েছি। রেমোর বয়স দশ আর এর আট।

—এত কম বয়সে বিয়ে দিলে? কাজটা যে বেআইনী হয়েছে।

—আইন ফাইন জানি নে বাবা। মেয়েটা হতভাগী, এর মা পাঁচ বছর রোগে ভুগে গেল সন জষ্টি মাসে ম'ল। বাপটা নক্ষীছাড়া, গাঁজা ভাং খেয়ে গেরুয়া পরে কোথা তারকেশ্বর কোথা ভদ্রেশ্বর টোটো করে ঘুরে বেড়ায়। তাই অনাথা মেয়েটাকে নিজের ঘরে এনে ছেলের সঙ্গে বে দিনু। ওদের ফুলুরির দোকানটাও আমি চালাচ্ছি। আমার তিন মেয়েই তো শ্বশুরঘর করছে, একটা বউ না আনলে কি আমার চলে বাবা? তা কেলিন্দী এখেনে এসে আপনাকে জ্বালাতন করছে বুঝি?

—না না, জ্বালাতন করে নি, একটু গল্প করছিল। তুমি আর একে কেলিন্দী ব'লো না রামের মা, এখন থেকে কৃষ্ণকলি ব'লো।

—হা রে কপাল, আমার খুড়শাশুড়ীর নাম যে কেষ্টদাসী! ঠাকুর দেবতার নাম কি মুখে আনবার জো আছে বাবা, শ্বশুর-বাড়ির গুষ্টি সব নাম দখল করে বসে আছে। দাদাশ্বশুর

ছিলেন ফরিদাস, শ্বশুরের নাম ফালিদাস, খুড়শ্বশুর ফ্রীধর, শাশুড়ী ফরস্বতী।

কৃষ্ণকলি বললে, আর তোমার নামটা বলে দিই মা? হি হি হি, ফুগ্‌গো ফুগ্‌গতিনাশিনী!

আমি বললুম, রামের মা, আদর দিয়ে তুমি বউটির মাথা খেয়েছ, মুখের ওপর তোমাকে ঠাট্টা করে!

রামের মা হেসে বললে, কি করি বাবা, ওর ধরনই ওইরকম। নিজের মায়ের যত্ন আর ক দিন পেয়েছে, জম্ম ইস্তক আমাকেই দেখছে কিনা। যে নতুন নামটি বললেন তার পুরোটি তো বলতে পারব নি, এখন থেকে একে কলি বলব। দেখুন বাবা, এর বন্নটা কালো বটে, কিন্তু খুব ছিরি আছে, ছাঁদটি পরিষ্কার, যেন বাটালি দিয়ে গড়া, আর ভারী সতীনক্ষী মেয়ে। বিম্‌লিটা হচ্ছে কুঁদুলি। এখন আসি বাবা। ঘরকে চল্‌ রে কলি।

আমি বললুম, কৃষ্ণকলি, তোমার বরকে নিয়ে এক দিন এখানে এসো।

রামের মা বললে, হা আমার কপাল, রেমোর যে বড্ড নজ্জা, বউএর সঙ্গে কোত্থাও যেতে চায় না। আজকালকার ছোঁড়াদের মতন তো নয় যে সোমত্ত বউকে নিয়ে চাদ্দিকে ধেই ধেই নেত্য করে বেড়াবে। রেমোর পরীক্ষেটা চুকে যাক, আমিই একদিন দুটিকে নিয়ে আসব।

কৃষ্ণকলি হাত নেড়ে বললে, সে তোমাকে কিচ্ছু করতে

হবে নি মা, আমি একাই তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব।

আমি বললুম, রামের মা, তোমার ছেলে তো সেকেলে, কিন্তু বউটি যে অত্যন্ত একেলে।

—ওটুকু সেরে যাবে বাবা, একটু বড় হলেই নজ্জা শরম আসবে।

রামের মা তার পুত্রবধূকে নিয়ে চলে গেল। কৃষ্ণকলির কপাল ভাল, আট বছর বয়সেই সে শাশুড়ীর কাছ থেকে সতী-লক্ষ্মী সার্টিফিকেট আদায় করেছে, এক মা হারিয়ে আর এক মা পেয়েছে, এমন বর পেয়েছে যাকে নির্বিবাদে চিমটি কাটা চলে আর হিড়হিড় করে টেনে আনা যায়।

১৩৫৯

জটাধর বকশী

নূতন দিল্লির গোল মার্কেটের পিছনে কুচা চমৌকিরাম নামে একটি গলি আছে। এই গলির মোড়েই কালীবাবুর বিখ্যাত দোকান ক্যালকাটা টি ক্যাবিন। এখানে চা বিস্কুট সস্তা কেক সিগারেট চুরুট আর বাংলা পান পাওয়া যায়, তামাকের ব্যবস্থা আর গোটাকতক হুঁকোও আছে। দু-এক মাইলের মধ্যে যেসব অল্পবিত্ত বাঙালী বাস করেন তাঁদের অনেকে কালীবাবুর দোকানে চা খেতে আসেন। সন্ধ্যার সময় খুব লোকসমাগম হয় এবং জাঁকিয়ে আড্ডা বসে।

পৌষ মাস পড়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা, বাইরে খুব ঠাণ্ডা, কিন্তু কালীবাবুর টি ক্যাবিন বেশ গরম। ঘরটি ছোট, এক দিকে চায়ের উনন জ্বলছে, পনের-ষোল জন পিপাসু ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছেন। সিগারেট চুরুট আর তামাকের ধোঁয়ায় ঘরের ভিতর ঝাপসা হয়ে গেছে।

রামতারণ মুখুজ্যে কথা বলছিলেন। এঁর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। মিলিটারী অ্যাকাউন্ট্‌সে কাজ করতেন, দশ বছর হল অবসর নিয়েছেন। দুই ছেলেও দিল্লিতে চাকরি পেয়েছে, সেজন্য রামতারণ এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। ইনি একজন সবজান্তা লোক, কথা বলতে আরম্ভ করলে থামতে

চান না, অন্য লোককে কিছু বলবার অবকাশও দেন না। চায়ের আড্ডার সবাই এঁকে উপাধি দিয়েছে—বিরাট ছেঁদা, অর্থাৎ দি গ্রেট বোর।

রামতারণবাবু বলছিলেন, আরে না না, তোমাদের ধারণা একবারে ভুল। ভূত আর প্রেত স্বতন্ত্র জীব, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। মৃত্যুর পর মানুষ যত দিন বায়ুভূত নিরালম্ব নিরাশ্রয় হয়ে থাকে, অর্থাৎ যে পর্যন্ত আবার জন্মগ্রহণ না করে তত দিন সে প্রেত। কিন্তু—

স্কুল মাস্টার কপিল গুপ্ত বললেন, অর্থাৎ পরলোকের ভ্যাগাবন্ডরাই প্রেত।

বক্তৃতায় বাধা পাওয়ায় রামতারণ বিরক্ত হয়ে বললেন, ফাজলামি রাখ, যা বলছি শুনে যাও। মৃত্যুর পর মানুষ চিরকাল প্রেত হয়ে থাকে না, আবার জন্মায়। ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। কিন্তু যারা ভূত তারা চিরকালই ভূত।

কপিল গুপ্ত আবার বললেন, বুঝেছি। যেমন গাজনের সন্ন্যাসী আর লোটা-চিমটা-কম্বল-ধারী বারমেসে সন্ন্যাসী।

—আঃ চুপ কর না। মরা মানুষের আত্মা হল প্রেত, বিলিতী গোস্ট্ও প্রেত। কিন্তু পিশাচ আর পল্টারগাইস্ট্কে ভূত বলা যেতে পারে। ভূত হল অপদেবতা, তারা নাকে কথা কয়, ভয় দেখায়, ঘাড় মটকায়, নানা রকম উপদ্রব করে। কিন্তু প্রেত সে রকম নয়, জীবদ্দশায় যার যেমন স্বভাব, প্রেত হলেও তাই থাকে। তবে চলিত কথায় প্রেতকেও লোকে ভূত বলে।

এই সময় একজন অচেনা লোক ঘরে প্রবেশ করলেন। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, ছ ফুট লম্বা, মজবুত গড়ন, মোচড় দেওয়া মোটা কাইজারী গোঁফ। গায়ে কালচে-খাকী মিলিটারী ওভার-কোট, পরনে ইজার আছে কি ধুতি আছে বোঝা যায় না, মাথায় পাগড়ির মতন বাঁধা কম্ফর্টার। আগন্তুক ঘরে এসে বাজখাঁই গলায় বললেন, নমস্কার মশাইরা, এখানে আপনাদের সঙ্গে বসে একটু চা খেতে পারি কি?

কয়েক জন এক সঙ্গে উত্তর দিলেন, বিলক্ষণ, চা খাবেন তার আবার কথা কি, এ তো চায়েরই দোকান। ওহে কালী-বাবু, এই ভদ্রলোককে চা দাও। আপনাকে তো আগে কখনও দেখি নি, নতুন এসেছেন বুঝি?

—নতুন নয়, দিল্লি আমার খুব চেনা জায়গা, তবে সম্প্রতি বহু কাল পরে এসেছি। পুরনো দিল্লির কেউ কেউ এখনও হয়তো আমার নাম মনে রেখেছেন—জটাধর বকশী। ও ম্যানেজারমশাই, দয়া করে আমাকে বেশ বড় এক পেয়ালা চা দিন, খুব গরম আর কড়া। একটা মোটা বর্মা চুরুট, দশ খিলি পান, এক ধেবড়া চুন, আর অনেকখানি দোক্তাও দেবেন। হাঁ, তার পর, ভূত প্রেতের কি যেন কথা হচ্ছিল আপনাদের। আমি একটু শুনতে পাই কি? এসব কথায় আমার খুব আগ্রহ আছে।

একজন উৎসুক নতুন শ্রোতা পেয়ে রামতারণবাবু খুশী হয়ে বললেন, হাঁ হাঁ শুনবেন বইকি। বলছিলুম, ভূত আর

প্রেত আসলে আলাদা জীব, তবে সাধারণ লোকে তফাত করে না। বাদশাহী আর ব্রিটিশ জমানায় ভূত প্রেতের কথা অনেক শোনা যেত, কিন্তু এখনকার এই সেকিউলার ভারতে তারা ফৌত হয়ে যাচ্ছে। গুরুমহারাজ পানিমহারাজ রাজজ্যোতিষী নেপালবাবা ইত্যাদির ওপর লোকের ভক্তি খুব বেড়েছে বটে, কিন্তু ভূত প্রেতের ওপর আস্থা কমে গেছে, সেজন্য তাদের দেখা পাওয়া এখন কঠিন।

কপিল গুপ্ত বললেন, বিশ্বাসে মিলয়ে ভূত, তর্কে বহু দূর।

জটাধর বকশী বলেন, ঠিক কথা। কিন্তু ভূত যদি প্রবল হয় তবে অবিশ্বাসীকেও দেখা দেয়। যদি অনুমতি দেন তো আমি কিছু বলি।

রামতারণবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আপনি ভূতের কি জানেন? গেল বছর যখন চাঁদনি চকের ঘড়িটা পড়ে গেল—

তিন-চার জন একবাক্যে বললেন, মুখুজ্যেমশাই, দয়া করে আপনি একটু থামুন, এঁকে বলতে দিন।

জটাধর বকশী বলতে লাগলেন।—বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে দিল্লিতে একবার প্রচণ্ড ভূতের উৎপাত হয়েছিল, আমাদের ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তার চমৎকার বৃত্তান্ত লিখেছেন। ভবানন্দ মজুমদারের ইষ্টদেবীকে জাহাঙ্গীর ভূত বলে গাল দিয়েছিলেন। প্রভুর আশকারা পেয়ে বাদশাহী সিপাহীরা ভবানন্দকে বললে—

অরে রে হিন্দুর পুত দেখলাও ক'হা ভূত
নহি তুঝে করুংগা দো টুক।
ন হোয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াঁও লেকে
জাতি লেউ' খেলায়কে থুক॥

তখন ভবানন্দ বিপন্ন হয়ে দেবীকে ডাকলেন। ভক্তের স্তবে তুষ্ট হয়ে মহামায়া ভূতসেনা পাঠালেন, তারা দিল্লি আক্রমণ করলে—

ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী গুহ্যক দানব দানা।
ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস সমরে দিলেক হানা॥
লপটে ঝপটে দপটে রবটে ঝড় বহে খরতর।
লপ লপ লম্ফে ঝপ ঝপ ঝম্ফে দিল্লি কাঁপে থরথর॥ ...
তাথই তাথই হো হো হই হই ভৈরব ভৈরবী নাচে।
অট্ট অট্ট হাসে কট মট ভাষে মত্ত পিশাচী পিশাচে॥

অবশেষে বেগতিক দেখে বাদশা ভবানন্দের শরণাপন্ন হলেন, বিস্তর ধন দৌলত খেলাত আর রাজগির ফরমান দিয়ে তাঁকে খুশী করলেন, তখন ভূতের উৎপাত থামল। সেকালের তুলনায় আজকাল ভূত প্রেত কিঞ্চিৎ দুর্লভ হয়েছে বটে, কিন্তু এই দিল্লিতে এখনও ভূত দেখা যায়।

কপিল গুপ্ত বললেন, মুখুজ্যেমশাই, আপনি তো প্রাচীন লোক, বহুকাল দিল্লিতে আছেন, ভূতের সঙ্গে কখনও আপনার মোলাকাত হয়েছিল?

রামতারণ বললেন, আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তোমাদের মতন অখাদ্য খাই না, নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করি। ভূতের সাধ্য নেই যে আমার কাছে ঘেঁষে।

কপিল গুপ্ত বললেন, আচ্ছা জটাধরবাবু, আপনাকে তো একজন চৌকস লোক বলে মনে হচ্ছে, আপনি ভূত দেখেছেন?

জটাধর বললেন, নিরন্তর দেখছি, ভূত দেখা অতি সহজ।

—বলেন কি! দয়া করে আমাদের দেখান না।

রামতারণ বললেন, ওসব বুজরুকি আমার কাছে চলবে না। ভূত প্রেত মানি বটে, একলা অন্ধকারে ভয়ও পাই, কিন্তু জটাধর কি ঘটাধর বাবু ভূত দেখাতে পারেন এ কথা বিশ্বাস করি না। কলেজে আমি রীতিমত সায়েন্স পড়েছি, ম্যাজিক-ওয়ালাদের জোচ্চুরিও আমার জানা আছে।

অট্টহাস্য করে জটাধর বললেন, যদি আপনাকে ভূত দেখাই?

—দেখাবেন বললেই হল! কবে দেখাবেন? কোথায় দেখাবেন? কখন দেখাবেন?

—আজই, এখানেই, এখনই দেখাতে পারি।

কপিল গুপ্ত বললেন, দেখিয়ে ফেলুন মশাই, আর দেরি করবেন না, আমাদের বাড়ি ফেরবার সময় হল। কিন্তু কি দেখাবেন, ভূত না প্রেত?

রামতারণবাবু প্রতিবাদ সইতে পারেন না। চটে গিয়ে বললেন, বেশ, এখনই দেখান, ভূত প্রেত বেম্মদত্যি শাঁখচুন্নী

যা পারেন। আমি বাজি রাখছি যে আপনি পারবেন না, শুধু ধাপ্পা দিচ্ছেন। ভূত দেখানো আপনার সাধ্য নয়।

জটাধর বললেন, আপনার চ্যালেঞ্জ মেনে নিলুম। মোটা টাকা বাজি রাখতে চাই না, কারণ আপনি নিশ্চয় হারবেন। ছা-পোষা পেনশনভোগী বুড়ো মানুষ, আপনার ক্ষতি করবার ইচ্ছে নেই। এই বাজি রাখা যাক যে ভূত যদি দেখাতে পারি তবে আমার চা চুরুট পানের দাম আপনি দেবেন। আর যদি হেরে যাই তবে আপনি যা খেয়েছেন তার দাম আমি দেব। রাজী আছেন? আপনারা সবাই কি বলেন?

সবাই বললেন, খুব ভাল প্রস্তাব, ভেরি ফেয়ার অ্যান্ড জেন্টলম্যানলি।

বর্মা চুরুটের উগ্র ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করতে করতে জটাধর বকশী বলতে লাগলেন।—উনিশ শ একচল্লিশ সালের কথা। তখন আমি বর্মায়, জেনারেল সিটওয়েলের স্যাপার্স অ্যান্ড মাইনার্স-এর দলে সিনিয়র হাবিলদার-আমিন। বর্মা থেকে চীন পর্যন্ত যে রাস্তা তৈরি হচ্ছিল তারই জরিপ আমাকে করতে হত। আমার ওপরওয়ালা অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন ব্যাবিট।

রামতারণবাবু বললেন, ওসব বাজে কথা কি বলছেন, আপনার চাকরির বৃত্তান্ত আমরা শুনতে চাই না। ভূত দেখাতে পারেন তো দেখান।

দুই হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়ে জটাধর বললেন, ব্যস্ত হবেন না সার, আমার কথাটি শেষ হবামাত্র ভূত দেখতে পাবেন। তখন জাপানীরা দক্ষিণ বর্মায় পেঁাছেছে, তাদের আর এক দল থাইল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে বর্মার উত্তরপূর্ব দিকে হানা দিচ্ছে। আমাদের সার্ভে পার্টি সে সময় শান স্টেটের উত্তরে কাজ করছিল। দলটি খুব ছোট, ক্যাপ্টেন ব্যাবিট, আমি, পাঁচজন গোর্খা সেপাই, পাঁচজন বর্মী কুলী, একটা জিপ, আর আমাদের তাঁবু রসদ থিওডোলাইট লেভেল চেন ঝাণ্ডা ইত্যাদি বইবার জন্য চারটে খচ্চর। আমরা যেখানে ছাউনি করেছিলুম সে জায়গাটা পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা, মানুষের বাস নেই। বাঘ ভালুক হুড়ার প্রভৃতি জানোয়ারের খুব উপদ্রব। বন্দুক দিয়ে মারা বারণ, পাছে শত্রুরা টের পায়। ব্যাবিট সায়েবের সঙ্গে এক টিন স্ট্রিকনীনের বড়ি ছিল, জিলাটিন দিয়ে মোড়া, পেটে গেলে তিন মিনিটের মধ্যে গলে যায়। মাংসের টুকরোর সঙ্গে সেই বড়ি মিশিয়ে ক্যাম্পের বাইরে ফেলে রাখা হত, রোজই দু-চারটে জানোয়ার মারা পড়ত।

একদিন গুজব শোনা গেল যে জাপানীরা আমাদের বিশ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। ক্যাপ্টেন ব্যাবিট বললেন, ওহে বকশী, শুধু তুমি আর আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি চল, আর সবাই ক্যাম্পেই থাকুক। চিয়াং কাই-শেক আমাদের সাহায্যের জন্য একটা চীনা পল্টন ইউনান থেকে পাঠিয়েছেন,

আজ তাদের এখানে পেঁাছবার কথা। দেখতে হবে তাদের কোনও পাত্তা মেলে কিনা।

আমরা দুজনে উত্তরপূর্ব দিকে চার-পাঁচ মাইল হেঁটে চললুম। সামনে একটা নিবিড় জঙ্গল, তার ওধারে একটা ছোট পাহাড়। সায়েব বললেন, ওই পাহাড়ের ওপর উঠে দূরবিন দিয়ে চারিদিক দেখতে হবে। আমরা জঙ্গলে ঢুকলুম, সঙ্গে সঙ্গে জন পঞ্চাশ জাপানী আমাদের ঘিরে ফেলল।

রামতারণবাবু অধীর হয়ে বললেন, ওহে বকশী, তুমি তো কেবলই বক বক করে চলেছ। শেষকালে হয়তো বলবে যে তুমি নিজেই একটা জাপানী ভূত দেখেছিলে। সেটি চলবে না বাপু, তোমার দেখা ভূত মানব না।

জটাধর বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর একটু পরেই আপনারা সবাই স্বচক্ষে ভূত দেখবেন। তার পর শুনুন।—ক্যাপ্টেন ব্যাবিট বললেন, বকশী, আত্মরক্ষার কোনও উপায় নেই, হাত তুলে সরেন্ডার কর। আমরা হাত তুলতেই জাপানীরা ছুটে কাছে এল। এমন রোগা হাড্ডি-সার পল্টন কোথাও দেখি নি। তাদের তিন-চার জন আমাদের গাল কাঁধ হাত পা টিপে টিপে দেখতে লাগল, একজন সায়েবের কাঁধে কামড়ে দিলে, আর সবাই তাকে ধমক দিয়ে টেনে নিয়ে গেল।

ব্যাবিট সায়েব একটু আধটু জাপানী ভাষা বুঝতেন। জিজ্ঞাসা করলুম, এদের মতলব কি? সায়েব বললেন, মাই

পুওর বকশী, বুঝতে পারছ না? এদের ভাঁড়ার শূন্য, রসদ যা আসছিল শান ডাকাতরা লুট করে নিয়েছে, সাত দিন উপোস করে আছে, খিদেয় পেট জ্বলছে। তার পর দেখলুম, ওদের কয়েকজন একটা উনন বানিয়ে আগুন জেবলেছে, তার ওপর মস্ত একটা ডেকচি চাপিয়েছে।

টি ক্যাবিনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বীরেশ্বর সিংগি একটু বেশী ভীতু। ইনি শিউরে উঠে বললেন, এই সময় চীনা পল্টন এসে পড়ল বুঝি?

জটাধর বললেন, কোথায় পল্টন! চারজন জাপানী এগিয়ে এল, দুজনের হাতে দড়ি, আর দুজনের হাতে তলোয়ার। সায়েব বললেন, বকশী, এই চারটে বড়ি এখনই গিলে ফেল। আমি বললুম, আগে থাকতেই বিষ খেয়ে মরব কেন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সায়েব ধমক দিয়ে বললেন, যা বলছি তাই কর, আমি তোমার কমাণ্ডিং অফিসার, অবাধ্য হলে কোর্ট মার্শালে পড়বে। কি আর করা যায়, বড়ি চারটে গিলে ফেললুম, সায়েবও গিললেন।

বীরেশ্বর সিংগি আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, বিষ খেলেন? তার পর চীনা ফৌজের ডাক্তার এসে বিষ বার করে ফেললে বুঝি?

—চীনা ফৌজ এক ঘণ্টা পরে এসেছিল। আমাদের যা হল শুনুন। দুটো জাপানী আমাদের হাত পা বেঁধে ঘাড়

নীচু করে বসিয়ে দিলে। আর দুটো জাপানী তলোয়ার দিয়ে ঘ্যাঁচ—

বীরেশ্বরবাবু মাথা চাপড়ে চিৎকার করে বললেন, ওরে বাপ রে বাপ!

—হাঁ মশাই, তলোয়ারের চোপ দিয়ে ঘ্যাঁচ করে আমাদের মুণ্ডু কেটে ফেললে।

রামতারণবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তবে বেঁচে আছেন কি করে?

বজ্রগম্ভীর স্বরে জটাধর বকশী বললেন, কে বললে বেঁচে আছি? আপনার হুকুমে বাঁচতে হবে নাকি? আমাদের কেটে টুকরো টুকরো করলে, ডেকচিতে সেদ্ধ করলে, চেটে পুটে খেয়ে ফেললে, খিদের চোটে স্ট্রিকনীনের তেতো টেরই পেলে না। তার পর তিন মিনিটের মধ্যে সব কটা জাপানী কনভলশন হয়ে পট পট করে মরে গেল। ক্যাপ্টেন ব্যাবিটের মতন বিচক্ষণ অফিসার দেখা যায় না মশাই, আশ্চর্য দূরদৃষ্টি। আচ্ছা, আপনারা বসুন, আমি এখন চললুম। ও কালীবাবু, আমার বিলটা রামতারণবাবুই শোধ করবেন। নমস্কার।

১৩৫৯

নিরামিষাশী বাঘ

অনেক বৎসর আগেকার কথা, তখন আলীপুর জন্তুর বাগানের কর্তা ডাক্তার যোগীন মুখুজ্যে। যোগীন আমার বন্ধু। একদিন টেলিফোনে বললে, ওহে, বড় বড় একজোড়া তিব্বতী পান্ডা এসেছে, খাসা জানোয়ার, দেখলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। সাদা গা, কালো পা, কাজলপরা চোখ, ভাল্লুককে টেনে লম্বা করলে যেমন হয় সেইরকম চেহারা। তোমারই মতন নিরামিষ খায়। দু দিন পরেই হামবুর্গ জু-তে চলে যাবে, দেখতে চাও তো কাল বিকেলে এস।

পরদিন বিকেলে যোগীনের কাছে গেলুম। পান্ডা, কাঙগারু, হিপ্পো, কালো রাজহাঁস, সাদা ময়ূর প্রভৃতি সবরকম দুর্লভ প্রাণী দেখা হল। তার পর বাঘ সিংগির খাওয়া দেখছি এমন সময় নজরে পড়ল একটা বাঘ ভাল করে খাচ্ছে না, যেন অরুচি হয়েছে। মাংসের চার দিকে তিন পায়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে একটু কামড় দিচ্ছে। যোগীনকে বললুম, আহা, বেচারার একটা পা জখম হয়েছে, খানিকটা মাংস কেউ যেন খাবলে নিয়েছে। গুলি লেগেছিল নাকি?

যোগীন বললে, গুলি লাগে নি। এই বাঘটির নাম রাম-

খেলাওন, এর ইতিহাস বড় করুণ। পাশের খাঁচার বাঘিনীটিকে দেখ।

পাশের খাঁচায় দেখলুম একটি খোঁড়া বাঘিনী রয়েছে। এরও অরুচি, কিন্তু তবুও কিছু খাচ্ছে। প্রশ্ন করলুম, দুটোই খোঁড়া দেখছি, কি করে এমন হল?

যোগীন বললে, এই বাঘিনীটির নাম রামপিয়ারী। রাম-খেলাওন আর রামপিয়ারী দুটোই বছর দুই আগে গয়া জেলার গড়বড়িয়ার জঙ্গলে ধরা পড়ে। এদের দস্তুর মত মন্ত্র পড়িয়ে বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু মনের মিল হল না, তাই আলাদা খাঁচায় রাখতে হয়েছে।

—ভারী অদ্ভুত তো। ইতিহাসটা বল না শুনি।

—তোমার তো সব দেখা হয়ে গেছে, এখন আমার বাসায় চল। চা খেতে খেতে ইতিহাস শুনবে।

যোগীনের কাছে যে ইতিহাস শুনেছিলুম তাই এখন বলছি।

গয়া জেলায় অনেক বড় বড় জমিদার আছেন। একজন হচ্ছেন চৌধুরী রঘুবীর সিং, প্রতাপপুর গ্রামে বাস করেন। ইনি খুব ধনী লোক, অনেক বিষয় সম্পত্তি, গড়বড়িয়ার জঙ্গল এঁরই জমিদারির অন্তর্গত। রঘুবীর রাজপুত ছত্রী, এককালে খুব শিকার করতেন, কিন্তু বুড়ো বয়সে তাঁর গুরু মহাত্মা রামভরোস স্বামীর উপদেশে সব রকম জীবহিংসা ত্যাগ

করেছেন, নিরামিষ খান, ত্রিসন্ধ্যা রামনাম জপ করেন। তাঁর কড়া শাসনে বাড়ির সকলেই মায় কাছারির আমলারা পর্যন্ত নিরামিষ খেতে বাধ্য হয়েছে।

রঘুবীর যখন শিকার করতেন তখন তাঁর সহচর ছিল অকলু খাঁ। সে এখন বেকার, কিন্তু নিয়মিত মাসহারা পায় এবং মনিবের সেলাখানায় যত বন্দুক তলোয়ার বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র আছে সমস্ত মেজে ঘষে চকচকে করে রাখে।

একদিন সকালবেলা রঘুবীর সিং বাড়ির সামনের চাতালে একটা খাটিয়ায় বসে গুড়গুড়ি টানছেন আর তাঁর পাঁচ বছরের নাতি লল্লুলালের সঙ্গে গল্প করছেন এমন সময় অকলু খাঁ এসে সেলাম করে বললে, হুজুর, একটা বড় বাঘ গড়বাড়িয়ার জঙ্গলে ধরা পড়েছে।

রঘুবীর বললেন, আহা, রামজীর জানবর, ওকে ফের জঙ্গলে ছেড়ে দাও।

লল্লুলাল বললে, না দাদুজী, ওকে আমি পুষব।

রঘুবীর নাতির আবদার ঠেলতে পারলেন না। হুকুম দিলেন, শাল কাঠের একটা বড় পিঁজরা বানাও, তার সামনে একটা আর পিছনে একটা কামরা থাকবে, যেমন কলকাতার চিড়িয়াখানায় আছে। মোটা মোটা সিক লাগানো হবে। দুই কামরার মাঝে একটা ফটক থাকবে, ছাদ থেকে জিঞ্জির টানলে ফটক খুলবে, তখন বাঘ কামরা বদল করতে পারবে।

দু দিনের মধ্যেই খাঁচা তৈরি হয়ে গেল, তাতে বাঘকে পোরা

হল। দেখাশোনার ভার অকল্দ খাঁর ওপর পড়ল। সে তার মনিবকে বললে, হুজুর, আমাদের যে বাঙালী ডাক্তারবাবু আছেন তিনি বলেছেন আলীপুরের চিড়িয়াখানায় প্রত্যেক বাঘকে দু-তিন দিন অন্তর সাত সের ঘোড়ার মাংস খেতে দেওয়া হয়। এখানে তো তা মিলবে না, আপনি খাসীর হুকুম করুন।

রঘুবীর বললেন, খবরদার, কোনও রকম গোশ্ত আমার কোঠির এলাকায় ঢুকবে না। এই বাঘের নাম দিয়েছি রাম-খেলাওন, ও গোশ্ত খাবে না।

—তবে কি রকম খানা দেওয়া হবে হুজুর?

—খানা কি কমী ক্যা? পুরি কচৌড়ি হালুআ লড্ডু খিলাও, চাহে দুধ পিলাও, রাবড়ি মালাই পেড়া বরফি ভি খিলাও।

ওই সব পবিত্র খাদ্যেরই ব্যবস্থা হল। রঘুবীর তাঁর লোকজনদের বিশ্বাস করলেন না, নাতিকে সঙ্গে নিয়ে নিজের সামনে বাঘকে খাওয়াতে এলেন। বাঘ একবার শুঁকে পিছন ফিরে বসল। রঘুবীর বললেন, এসব জিনিস খাওয়া তো অভ্যাস নেই, নিয়মিত দিয়ে যাও, দিন কতক পরেই খেতে শিখবে।

দু দিন অন্তর রামখেলাওনকে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হতে লাগল, কিন্তু একটু দুধ আর মালাই ছাড়া সে কিছুই খায় না। পুরি কচৌড়ি পেড়া ইত্যাদি সবই অকল্দ খাঁ আর অন্যান্য চাকরদের জঠরে যেতে লাগল।

নিরামিষাশী বাঘ

মানুষকে যদি অন্য কোনও খাবার না দিয়ে শুধু ঘাস দেওয়া হয় তবে খিদের তাড়নায় সে ঘাসই খাবে। রামখেলাওনও অবশেষে পুরি কচৌড়ি পেড়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক খাদ্য খেতে শুরু করলে।

চৌধুরী রঘুবীর সিংএর একটি দাতব্য দাবাখানা আছে, ডাক্তার কালীচরণ পাল তার অধ্যক্ষ। মনিবের আদেশে কালীবাবু রোজই একবার বাঘটিকে দেখেন। তিনি জন্তুর ডাক্তার নন, তবু বুঝতে দেরি হল না যে রামখেলাওনের গতিক ভাল নয়। তার পেট মোটা হচ্ছে, কিন্তু ফুর্তি নেই, ঝিমিয়ে আছে। কালীবাবু ডায়াগনোসিস করে রঘুবীরের কাছে এলেন।

রঘুবীর প্রশ্ন করলেন, ক্যা খবর ডাকটর বাবু, রামখেলাওন তো বহুত মজে মে হৈ?

কালীবাবু বললেন, না চৌধুরীজী, মোটেই ভাল নেই। ওর ডায়াবিটিস হয়েছে।

—সে কি? ভাল ভাল জিনিসই তো ওকে খেতে দেওয়া হচ্ছে, আমি যা খাই বাঘও তাই খাচ্ছে।

—কি জানেন, বাঘ হল কার্নিভোরস গোশ্‌তখোর জানোয়ার। কার্বোহাইড্রেট খাদ্য ওর সহ্য হচ্ছে না, গ্লুকোজ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রোজ তিন বার ইনসুলিন দেওয়া দরকার, কিন্তু দেবে কে?

—কি বলছ বুঝতে পারছি না। তুমি বাঘের ইলাজ করতে না পার তো পাটনা থেকে বড় ডাক্তার আনাও।

—আপনি ইচ্ছা করলে বড় ডাক্তার আনাতে পারেন, কিন্তু কেউ কিছুই করতে পারবে না। ছাগল যেমন মাংস হজম করতে পারে না, বাঘ তেমনি পুরি কচৌড়ি পারে না। ওকে যদি বাঁচাতে চান তবে মাংসের ব্যবস্থা করুন।

রঘুবীর সিং চিন্তিত হয়ে বললেন, বড়ী মুশকিল কি বাত। আচ্ছা, কাল আমার গুরুমহারাজ রামভরোসজী আসছেন, তিনি কি বলেন দেখা যাক।

গুরুমহারাজ এলেন। রঘুবীর তাঁকে বাঘ দেখাতে নিয়ে গেলেন, ডাক্তার কালীবাবুও সঙ্গে গেলেন।

রামভরোসজী খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বাঘকে প্রশ্ন করলেন, ক্যা বেটা রামখেলাওন, ক্যা হুয়া তেরা? বাঘ মৃদুস্বরে উত্তর দিলে, হুলুম।

রামভরোস বললেন, সমঝ লিয়া। আরে ই তো বহুত মামুলী বীমারী। বির্হা হুয়া।

কালীবাবু বললেন, বির্হা কিরকম বেয়ারাম?

—নহি সমঝা? বাঘ বাঘিনী মাংতা।

কালীবাবু বললেন, ও, বাঘের বিরহ হয়েছে, তাই ঝিমিয়ে আছে। তবে চটপট বাঘিনী যোগাড় করুন।

চৌধুরী রঘুবীর সিংএর লোকবল অর্থবল প্রচুর। তিন দিনের মধ্যে একটা তরুণী বাঘিনী ধরা পড়ল। রামভরোসজী তার নাম রাখলেন রামপিয়ারী। বিধান দিলেন, আলাদা

পিঁজরায় রেখে বাঘিনীকেও পুরি কচৌড়ি ওগয়রহ খেতে দেওয়া হক। যখন নিরামিষ ভোজনে অভ্যস্ত হবে, বাঘ বাঘিনী দুজনেই সাত্ত্বিক স্বভাব পাবে, তখন পুরুত ডাকিয়ে বিয়ে দিয়ে এক খাঁচায় রাখবে।

খিদের জ্বালায় বাঘিনীও ক্রমশ পুরি কচৌড়ি পেড়া ইত্যাদি খেতে আরম্ভ করলে। সাত্ত্বিক আহারের ফলে বাঘের যেসব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল বাঘিনীরও তাই দেখা গেল। তখন রামভরোস স্বামীর উপদেশে ঘটা করে বিয়ে দেবার আয়োজন হল, ঢোল বাজল, পুরোহিত মিসিরজী মন্ত্রপাঠ করলেন, তবে দুই থাবা এক করে দেবার সাহস তাঁর হল না। বাঘ-বাঘিনীর বাসের জন্য একটা খাঁচা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তার মধ্যে বড় বড় বারকোশে নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী এবং পান সুপারী কর্পূর ছোয়ারা নারকেল-কুচি প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য রাখা হল।

বিবাহসভায় রঘুবীর সিং, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, রাম-ভরোসজী, কালীবাবু, অকলু খাঁ এবং আরও বিস্তর লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই আশা করলেন যে এইবারে এদের মেজাজ ভাল থাকবে, খাদ্য হজম হবে, দুটিতে মিলে মিশে সুখে ঘরকন্না করবে।

বর-কনের শুভদৃষ্টি-বিনিময় কেমন হয় দেখবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। শুভ মুহূর্তে শাঁখ বেজে উঠল, বিহারের প্রথা অনুসারে পুরনারীরা চিৎকার করে গাইতে

লাগল—পরদেসীয়া আওল আঙগানা। অকল্ খাঁ কপাট টেনে নিয়ে নবদম্পতিকে এক খাঁচায় পুরে দিলে।

ফ্রয়েডের শিষ্যরা যাই বলুন, প্রাণীর আদিম প্রেরণা ক্ষুৎপিপাসা। রামখেলাওন আর রামপিয়ারী হিংস্র শ্বাপদ, নামের আগে রাম যোগ করে এবং অনেক দিন নিরামিষ খাইয়েও তাদের স্বভাব বদলানো যায় নি। চার চক্ষুর মিলন হবা মাত্র আমিষবুভুক্ষু দুই প্রাণীর ক্যানিবাল প্রবৃত্তি চাগিয়ে উঠল, প্রচণ্ড গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা পরস্পরের সামনের বাঁ পায়ে কামড় দিয়ে এক এক গ্রাস মাংস তুলে নিলে।

বাঘের গর্জন, রক্তের স্রোত, মানুষের চিৎকার, লল্লুলালের কান্না সমস্ত মিলে সেই বিবাহসভায় হুলস্থূল পড়ে গেল। রঘুবীরের আদেশে অকলু খাঁ একটা জ্বলন্ত মশালের খোঁচা দিয়ে কোনও রকমে বাঘ দুটোকে তফাত করে তাদের নিজের নিজের খাঁচায় পুরে দিলে। রামভরোস মহারাজ বললেন, এই দুই জীব পূর্বজন্মে বহু পাপ করেছিল তাই এই দশা হয়েছে, এদের চরিত্র দুরস্ত হতে আরও চুরাশি জন্ম লাগবে।

রঘুবীর সিং জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু, এখন কি করা উচিত?

কালীবাবু বললেন, চৌধুরীজী, আপনি তো চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, এরা যখন কিছুতেই সাত্ত্বিক হল না তখন আর দেরি না করে এদের আলীপুর পাঠিয়ে দিন।

তার পর যোগীন আমাকে বললে, রঘুবীর সিং বাঘ দুটোকে বিদেয় করতে রাজী হলেন। কালীবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তিনি সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমাকে একটি চিঠি লিখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আলীপুর জন্য এই দুটো বাঘকে রাখবে কিনা। খোঁড়া বাঘ শুনে ট্রাস্টীরা প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন। কিন্তু চৌধুরী রঘুবীর সিং দিলদরিয়া লোক, ব্যাঘ্রদম্পতির যৌতুক স্বরূপ হাজার-এক টাকার একটি চেক আগাম পাঠিয়ে দিলেন। আর কোনও আপত্তি হল না, রামখেলাওন আর রামপিয়ারী কালীবাবুর সঙ্গে এসে আমাদের এখানে ভরতি হল। এখন মোটের ওপর ভালই আছে, তবে অনেক দিন সাত্ত্বিক আহারের ফলে ওদের প্যাংক্রিয়াজ ড্যামেজ হয়েছে, হজমশক্তি কমে গেছে, মেজাজও খিটখিটে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মোটেই বনে না।

১৩৫৯

বরনারীবরণ

সজ্জনসংগতির নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। খবরের কাগজে যাঁদের ওয়াকিফহাল মহল বলা হয় তাঁরা সকলেই একমত যে এর মতন উঁচুদরের অভিজাত ক্লাব কলকাতায় আর নেই। নামটি মোহমুদ্গর থেকে নেওয়া বটে, কিন্তু এখানে এর মানে সাধুসঙ্গ নয়। সজ্জনসংগতি — কিনা শিক্ষিত শৌখিন নরনারীর মিলনস্থান। আপনি যদি আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখক চিত্রকর নটনটী গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে দেখতে চান তবে এখানে আসতেই হবে। যদি আলট্রামডার্ন ফ্যাশন আর চালচলন শিখতে চান তবে এই ক্লাব ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বাৎসরিক চাঁদা নগদ এক শ টাকা। ক জন তা দিতে পারে? চাঁদার টাকা যদি বা যোগাড় করলেন তবু দরজা খোলা পাবেন না। সজ্জনসংগতির সদস্যসংখ্যা ধরাবাঁধা আড়াই শ। যদি একটা পদ খালি হয় এবং অন্তত পঞ্চাশ জন সদস্যের সম্মতি আনতে পারেন তবেই আপনার আশা আছে। কিন্তু যদি আপনার বরাত ভাল হয় তবে সুপারিশের জোরে ক্লাবের কোনও বিশেষ অধিবেশনে আপনি অতিথি হিসাবে বিনা খরচে নিমন্ত্রণ পেয়ে যেতে পারেন।

ক্লাবটি চালাবার ভার যাঁদের উপর তাঁরা পাঁচ বছর অন্তর

নির্বাচিত হন। বর্তমান সভাপতি অনুকূল চৌধুরী একজন মনীষী লেখক ও সুবক্তা, বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রগামিনী'র মালিক ও সম্পাদক। এঁর বয়স এখন পঁয়ষট্টি, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের সঙ্গেই মিশতে পারেন সেজন্য সকলেরই ইনি প্রিয়। কর্মাধ্যক্ষ দুজন, কপোত গুহ আর সোহনলাল সাহু। কপোত গুহ ব্যারিস্টার, বয়স চল্লিশের নীচে, পসার নেই কিন্তু পৈতৃক টাকা দেদার আছে। সোহনলাল ধনী কারবারী যুবক, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, খুব শৌখিন, ছাপরার লোক হলেও বাঙালীর সঙ্গেই বেশী মেশেন। ইনি বলেন, বিহার প্রদেশের সমস্তই বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার, নতুবা বিহারী কালচারের উন্নতি হবে না।

বিকাল বেলা প্রগামিনী পত্রিকার অফিসে অনুকূল চৌধুরী, কপোত গুহ আর সোহনলাল সাহু সজ্জনসংগতির আগামী অধিবেশন সম্বন্ধে পরামর্শ করছেন। কপোত গুহ একটু চঞ্চল হয়ে বলছিলেন, এ রকম করে ক্লাব চালানো যাবে না দাদা। প্রত্যেক বৈঠকে সেই একঘেয়ে প্রোগ্রাম, ভূপালী বোসের গান, লুলু চ্যাটার্জীর নাচ, দরদী সেনের ন্যাকা ন্যাকা আবৃত্তি, জগাই বারিকের রাসলীলা ব্যাখ্যা, আর শসার স্যান্ড-উইচ কেক শিঙাড়া সন্দেশ পেস্তা-বাদাম-ভাজা আইসক্রীম চা।

অনুকূল বাবু বললেন, বেশ তো, কি রকম করতে চাও তাই বল না।

সোহনলাল বললেন, গুহ সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেছে দাদা। সেদিন প্রাচী-প্রতীচী সংঘের জয়ন্তী হয়ে গেল, তারা একটি চমৎকার ট্যাবলো দেখিয়েছে। ডলি বাগচীর ক্লিওপেট্রা, পবন ঘোষের অ্যান্টনি, আর ইরফান আলীর ঘটোৎকচ দেখে সকলে অবাক হয়ে গেছে। ঘটোৎকচ ক্লিওপেট্রাকে কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে আর অ্যান্টনি ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। যারা দেখেছে তারা সবাই ধন্য ধন্য করছে।

অনুকূলবাবু বললেন, তোমরাও তো ওইরকম কিছু একটা করতে পার। গজেন গুপ্তকে বললে একদিনের মধ্যে একটা একাঙ্ক নাটক লিখে দেবে।

সোহনলাল বললেন, আমার মতে সিপাহী যুদ্ধের কোনও ঘটনা দেখালে খুব ভাল হবে। এই ধরুন—নানা সাহেব জেনারেল ম্যাকআর্থারকে বন্দী করে এনে নিজের স্ত্রীকে বলছেন, এই ফিরঙ্গী তোমার জিম্মায় রইল, ফুরসত হলেই একে পাঁচ টুকরা করবে, আমি আবার লড়াইএ চললুম। ম্যাক-আর্থার পায়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা করলেন। নানী সাহেবার দয়া হল, বললেন, জান নহি লুংগি, সির্ফ্ নাক কাট দুংগি।

কপোত গুহ ঘাড় নেড়ে বললেন, আমরা কারও নকল করতে চাই না, একবারে নতুন কিছু দেখাতে চাই। শুনুন দাদা—বিলেতে যেমন মে-কুইন ইলেকশন হয়, আগামী অধিবেশনে আমরা তেমনি উপস্থিত মহিলাগণের একজনকে বসন্তরানী নির্বাচন করব।

—বল কি হে, জৈষ্ঠি মাসের গুমোট গরমে বসন্তরানী!

—আচ্ছা, আষাঢ় মাসে হতে পারে, তখন গরম কমে যাবে। উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে যিনি সব চেয়ে সুন্দরী তাঁকে আমরা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা উপাধি দিয়ে ফুলের মুকুট পরিয়ে দেব, একটি সোনার ঘড়িও উপহার দিতে পারি।

সোহনলাল বললেন, সে খুব ভাল হবে দাদা। খবরটি যদি আগে কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয় তবে সমস্ত মেম্বার আর মেম্বেসরা তো হাজির হবেনই, বাইরের লোকেও অ্যাড-মিশনের জন্য ভিড় করবে। যদি দশ টাকার টিকিট করা হয় তা হলেও বিস্তর লোক তামাশা দেখতে আসবে।

অনুকূলবাবু বললেন, আইডিয়াটা ভাল, কিন্তু সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলা চলবে না, তাতে অনর্থক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। সাধারণ লোকে অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যেই সুন্দরী খোঁজে। কিন্তু আমাদের সদস্যারা সকলেই তরুণী নন, অনেকের বয়স হয়েছে অথচ রূপের খ্যাতি আছে। এইসব হোমরাচোমরা ফ্যাট ফেয়ার অ্যান্ড ফর্টি বা ফর্টি-উত্তীর্ণা মহিলারা যদি দেখেন যে তাঁদের কোনও আশা নেই তবে ভীষণ চটে যাবেন, চাই কি ক্লাবের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেন। তা হলে তো সজ্জনসংগতি উঠে যাবে।

কপোত গুহ চিন্তিত হয়ে বললেন, ভাবিয়ে তুললেন দাদা, আপনার কি অসাধারণ দূরদৃষ্টি! সুন্দরীশ্রেষ্ঠা

নির্বাচন—এ কথা বললে সিচুয়েশন একটু ডেলিকেট হবে বটে। কি বললে ভাল হয় আপনিই স্থির করুন।

অনুকূলবাবু বললেন, বরনারীবরণ মন্দ হবে না। যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা কারও বরনারী হতে বাধা নেই। ফুলের মুকুট আর ঘড়ি না দেওয়াই ভাল, একটা জাঁকালো বরমাল্য দিলেই চলবে।

সোহনলাল বললেন, বরনারীর ইলেকশন কি রকম হবে? আমার মতে সিক্রেট ব্যালটের ব্যবস্থা করা দরকার, তা হলে সকলেই চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে ভোট দিতে পারবে।

অনুকূলবাবু বললেন, তাতে জনমতের নির্ধারণ হবে বটে, কিন্তু তার পরিণামটা ভেবে দেখেছ? তারক মল্লিকের মেয়ে কিরণশশী—আজকাল যে হ্লাদিনী দেবী নাম নিয়ে গৌড়ীয় লাস্যনৃত্যম্ দেখাচ্ছে—সেই সব চেয়ে বেশী ভোট পাবে। তার পরেই বোধ হয় সুরেন ভৌমিকের গুজরাটী স্ত্রী কলাবতী ভৌমিক কিংবা আমাদের ডকটর নিয়োগীর স্ত্রী বঞ্জুলা নিয়োগীর চান্স। ভোটে যেই জিতুক, সদস্যারা সবাই তাঁদের স্বামীদের ওপর চটবেন, বাড়িতে মুখ হাঁড়ি করে থাকবেন, একটা পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমাদের মেয়েরা এখনও পাশ্চাত্ত্য নারীর উদারতা পায় নি, সবাই শ্রীরাধার মতন জেলস। তা ছাড়া ব্যালটে বিস্তর সময় লাগবে, লোকের ধৈর্য থাকবে না। ক্লাবের মেম্বাররা আমোদ চায়, ব্যালটের মতন নীরস ব্যাপারে সময় নষ্ট করা পছন্দ করবে না। ব্যালট নয়, সেকালের স্বয়ংবর সভার মতন কিছু করাই ভাল। সভায় যাঁরা

উপস্থিত থাকবেন তাঁদেরই একজনকে বরয়িতা বা বিচারক করা হবে। তিনি বরমাল্য হাতে নিয়ে সভা পরিক্রমণ করবেন, প্রত্যেক মহিলার চেহারা ঠাউরে দেখবেন, তার পর যাঁকে বর-নারী সাব্যস্ত করবেন তাঁর গলায় মালা দেবেন। এতে পারিবারিক অশান্তি হবে না। বরমাল্য যাঁকেই দেওয়া হক, মেয়েরা শুধু বিচারকের ওপর চটবেন, তাঁদের স্বামীদের দোষ ধরবেন না।

সোহনলাল বললেন, খুব ভাল হবে। জজ মশাই যখন ঘুরে ঘুরে ইন্‌স্পেকশন করবেন তখন মহিলাদের বুক তড়প তড়প করবে, আর পুরুষরা খুব মজা পাবে। হয়তো চুপি চুপি বাজি ধরবে—ফোর টু ওআন হ্লাদিনী দেবী, থ্রি টু ওআন কলাবতী ভৌমিক। এর চেয়ে আমোদ হতেই পারে না।

আরও কিছুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হল যে আষাঢ় মাসের অধিবেশনে বরনারীবরণের ব্যবস্থা হবে। বিচারক কে হবেন তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই, সভাতে স্থির করলেই চলবে। বরনারীর নির্বাচনে কিছু গলদ হলেও ক্ষতি হবে না, সদস্যারা যদি হুজুগে মেতে একটু উত্তেজনা আর আনন্দ উপভোগ করেন তা হলেই আয়োজন সার্থক হবে।

কপোত গুহ আর সোহনলাল সাহু যাবার জন্য উঠলেন। অনুকূল চৌধুরী বললেন, হাঁ, ভাল কথা—আমার বেহাই রাখহরি লাহিড়ী সস্ত্রীক কাশী থেকে আসছেন, পুরী ঘুরে এসে কিছু দিন আমার কাছে থাকবেন। এককালে ইনি গোরখ-

পুর ডিভিশনের বড় এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, বেশ পণ্ডিত লোক। বয়স আশি পেরিয়েছে কিন্তু খুব শক্ত আছেন, তাঁর গিন্নীরও প্রায় বাহাত্তর হবে। কাশীতে ছেলের কাছে থাকেন, কিন্তু সেখানকার গরম এখন আর বুড়ো বুড়ীর সয় না। লাহিড়ী মশাইকে অতিথি হিসেবে একটা নিমন্ত্রণপত্র দিও, তাঁর স্ত্রী থাকমণি দেবীকেও দিও। আমি সস্ত্রীক সজ্জনসংগতিতে যাব, বেহাই বেহানকে বাড়িতে ফেলে রাখা ভাল দেখাবে না।

কপোত গুহ বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। সোহনলাল আর আমি আপনার বাড়িতে গিয়ে তাঁদের নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে আসব।

কপোত গুহর চেষ্টায় বরানগরের ভাগীরথী ভিলা নামক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িটি যোগাড় হয়েছে, এখানেই বরনারী-বরণ হবে। সজ্জনসংগতির আড়াই শ সদস্য-সদস্যা সকলেই এসেছেন, তা ছাড়া তাঁদের সুপারিশে প্রায় এক শ জন অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। চার দিক গাছে ঘেরা খোলা মাঠে সভা বসেছে, যদি বৃষ্টি হয় তবে বাড়ির বড় হল ঘরে উঠে গেলেই চলবে। স্ত্রীপুরুষের আলাদা বসবার ব্যবস্থা হয় নি, অন্যান্য অধিবেশনের মতন এবারেও সকলে ইচ্ছামত মিলে মিশে বসেছেন। কেবল দশ-বারো জন স্কুল-কলেজের মেয়ে এক পাশে দল বেঁধে মহা উৎসাহে আড্ডা দিচ্ছে।

মাঠের এক ধারে সভাপতি অনুকূল চৌধুরী বসেছেন। নিকটেই তাঁর স্ত্রী সরসীবালা দেবী, বেহাই রাখহরি লাহিড়ী,

বেহান থাকমণি দেবী, এবং কয়েকজন মান্যগণ্য সদস্য-সদস্যা আর আমন্ত্রিত অতিথি আসন পেয়েছেন। কপোত গুহ, সোহনলাল সাহু এবং অন্যান্য কর্মকর্তারাও কাছে আছেন।

প্রথমেই সভাপতি বললেন, আপনারা আমন্ত্রণপত্রে পড়েছেন যে আজ আমরা এখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আশা করি সেটি সকলেরই উপভোগ্য হবে। আমাদের মামুলী কৃত্য যা আছে তা আগে চুকে যাক, তার পর বরনারী-বরণ হবে।

যথারীতি বেহালা এসরাজ বাঁশির কনসার্ট, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, আর জলযোগ শেষ হল। অধ্যাপক কপিঞ্জল গাঙ্গুলী বৈদিক যুগের নক্তগোষ্ঠী বা নাইট ক্লাব সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়বার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু তাঁর পাশের সদস্যরা তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তার পর সভাপতি ঘোষণা করলেন— আজ আমরা উপস্থিত মহিলাগণের মধ্য থেকে একজনকে বর-নারী রূপে বরণ করব। বরয়িতা অর্থাৎ বিচারক কে হবেন, কাকে আপনারা এই দুরূহ কর্মের জন্য যোগ্যতম মনে করেন, তাঁর নাম আপনারাই প্রস্তাব করুন।

রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্যভাস্বতী একজন উঁচুদরের লেখিকা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, শ্যামবর্ণ লম্বা চওড়া দশা-সই চেহারা, মুখটি বেশ ভারী আর গম্ভীর। দশ বৎসর আগেও এঁর লেখা খুব জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অর্বাচীন লেখক-লেখিকাদের উপদ্রবে এঁর বইএর কাটতি ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

রাজলক্ষ্মী দেবী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আপনারা যা করতে চাচ্ছেন তা আমাদের ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী। প্রকাশ্য সভায় একজন পরপুরুষ একজন পরনারীকে বরনারী আখ্যা দিয়ে মাল্যদান করবে—সেই নারী কুমারী সধবা বিধবা যাই হক না কেন—এ অতি অশোভন নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। বিলাতে এসব অনাচার চলতে পারে, কিন্তু এদেশের রুচিতে তা সইবে না। আমাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী, সর্বসাধারণের দৃষ্টিভোগ্যা বিলাসিনী সুন্দরী নয়। একেই তো আজকালকার মেয়েরা সিনেমার নটী হবার জন্য মুখিয়ে আছে, তার ওপর যদি আপনারা বরনারীবরণ আরম্ভ করেন তবে সমাজ অধঃপাতে যাবে। আমি আপনাদের সংকল্পিত অনুষ্ঠানে ঘোর আপত্তি জানাচ্ছি।

কপোত গুহর বৃদ্ধা পিসী পাশেই বসে ছিলেন। ইনি বললেন, রাজলক্ষ্মী ঠিক কথা বলেছে। বরনারী টরনারী চলবে না, যত সব ইল্লুতে কাণ্ড।

রাজলক্ষ্মী দেবীর স্বামী কাউনসিলার বামাপদ ঘোষাল একটু পিছনে বসে ছিলেন। ইনি লাজুক লোক, বেশী কথা বলেন না। এখন কর্তব্য বোধে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বরনারী-বরণ আমারও পছন্দ নয়।

সভাপতি বললেন, দুজন সদস্যা আর একজন সদস্য আপত্তি জানিয়েছেন। যদি অন্তত চার আনা সদস্যের অমত থাকে তবে আমরা বরনারীবরণ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেব।

শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্যভাস্বতীর সঙ্গে যাঁরা একমত তাঁরা দয়া করে হাত তুলুন।

রাজলক্ষ্মী, তাঁর স্বামী, আর কপোত গুহর পিসী ছাড়া অন্য কেউ হাত তুললেন না। সভাপতি বললেন, বরনারীবরণে যাঁদের মত আছে তাঁরা এইবারে হাত তুলুন।

প্রায় তিন শ জন হাত তুললেন, যেসব মেয়েরা আড্ডা দিচ্ছিল তারা দু হাত তুললে। সভাপতি বললেন, দেখা গেল পনরো আনার বেশী সদস্যের সম্মতি আছে, অতএব বরনারী-বরণ হবে। এখন আপনাদের মধ্য থেকে কেউ বরয়িতা বা বিচারকের নাম প্রস্তাব করুন।

কপোত গুহর তালিম অনুসারে বিখ্যাত উপন্যাসলেখক অরিন্দম সান্যাল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি প্রস্তাব করছি—খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-প্রয়োজক শ্রীযুক্ত ভূপেন হালদার মশাইকে বরনারীবরণের ভার দেওয়া হক। নারীর রূপের সমঝদার এঁর চাইতে ভাল কেউ নেই। আমার মতে ইনিই যোগ্যতম বরয়িতা।

ভূপেন হালদার দাঁড়িয়ে উঠে করজোড়ে বললেন, আপনারা আমাকে মাপ করবেন, আমি এই কাজের মোটেই উপযুক্ত নই। আমি নারী দেখি ক্যামেরার দৃষ্টিতে, পর্দায় তাঁদের রূপ কি রকম ফুটে উঠবে তাই আমার বিচার্য। রক্তমাংসের নরনারী সোজা চোখে কেমন দেখায় তার অভিজ্ঞতা আমার বিশেষ কিছু নেই।

সোহনলালের উসকানিতে আর একজন সদস্য প্রস্তাব

করলেন, প্রবীণ চিত্রকর স্বনামখ্যাত নিখিলেশ্বর সেন মহাশয়কে বরয়িতা করা হক।

নিখিলেশ্বর হাত জোড় করে বললেন, মাপ করবেন মশাইরা। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, সাহায্য করবার দ্বিতীয় লোক নেই, গৃহিণীই একমাত্র ভরসা। তিনি বাড়িতে ঘর-কন্নার কাজে ডুবে আছেন এই মওকায় যদি আমি একজন বরনারীকে মাল্যদান করি তবে গৃহিণী খুশী হবেন না। কাগজে আর ক্যাম্বিসে হরেক রকম বরনারী আঁকতে পারি—শাড়ি সিঁদুর-টিপ পরা মেম, ঢুলু ঢুলু চৈনিক-নয়না ওরিয়েণ্টাল ললনা, পটের সুন্দরী যার পটোলচেরা চোখ মুণ্ডুর বাইরে বেরিয়ে আসে—সব রকমই আমি এঁকে থাকি। কিন্তু একজন জলজ্যান্ত সুন্দরীকে সামনাসামনি বরণ করব এমন বুকের পাটা আমার নেই।

ছাত্রীদের আড্ডা থেকে রব উঠল, যত সব ভীরু কাওআর্ড।

প্রতাপগড় কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্‌সিপাল গগন বাঁড়ুজ্যে বললেন, আমাদের সদস্যদের সংকোচ হবারই কথা। এত দিন ধরে যাঁদের দেখে আসছেন তাঁদের একজনকে আজ হঠাৎ বরমাল্য দিতে চক্ষুলজ্জা হতেই পারে। বরনারীবরণের ভার কোনও নতুন লোককে দেওয়াই ভাল। ভাগ্যক্রমে রিটায়ার্ড এগ্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার শ্রদ্ধেয় রাখহরি লাহিড়ী মশাই এখানে উপস্থিত আছেন। ইনি বহুদর্শী বিচক্ষণ ঋষিতুল্য লোক, বয়সে আমাদের সকলের চাইতে বড়, নির্ভীক স্পষ্টবক্তা

বলে এ'র খ্যাতি আছে। কর্নেল গ্রেহাম সায়েবকে ইনি মুখের ওপর ড্যাম ফুল বলেছিলেন, সেজন্যই রায়বাহাদুর খেতাব পান নি। আমার প্রস্তাব, এ'কেই বরয়িতা করা হক।

একজন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। অনুকূল-বাবু তাঁর বেহাইকে বললেন, আপত্তি করবেন না লাহিড়ী মশাই, আপনিই আমাদের ভরসা। রাখহরিবাবু তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন, গিন্নী কি বল, রাজী হব নাকি?

থাকমণি দেবী কানে একটু কম শোনেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। অনুকূলবাবুর স্ত্রী সরসীবালা তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। থাকমণি বললেন, বেশ তো, যাকে পছন্দ হয় মালা দাও না গিয়ে, কে বারণ করছে। আমি তো একটা অখদ্যে থুত্থুড়ী বুড়ী।

সরসীবালা বললেন, ওকি, দিদি, খুশী মনে হুকুম দিন, তা না হলে ওঁর যেতে সাহস হবে কেন। সভায় এত লোক ওঁর জন্য হা-পিত্যেশ করছে, ওদের হতাশ করবেন না।

থাকমণি বললেন, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, খুশী মনেই বলছি। ওই তো গণ্ডা গণ্ডা রূপসী বসে রয়েছে, যাকে মনে ধরে স্বচ্ছন্দে মালা দিয়ে এস, আমার তাতে কি।

থাকমণি দেবী একটু বেশী বুড়ো হয়ে পড়েছেন, কিন্তু তাঁর স্বামীর চেহারাটি দেখবার মতন। লম্বা মজবুত গড়ন, ফরসা রং, পাকা চুল, পাকা গোঁফ-দাড়ি, যেন থিয়েটারের

ভীষ্ম। পত্নীর সম্মতি পেয়ে রাখহরিবাবু দাঁড়িয়ে উঠে স্মিতমুখে বললেন, সভাপতি ভায়া, মাননীয় মহিলা ও ভদ্রবৃন্দ, মা-লক্ষ্মীগণ, এবং দিদিমণিগণ, আমার ওপর আপনারা বড় কঠিন কর্তব্য চাপিয়েছেন। কিন্তু আমি পিছপা নই, এর চাইতেও শক্ত কাজ ঢের করেছি। গোড়াতেই আমি বরনারীর লক্ষণ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—beauty is skin deep, অর্থাৎ রূপের দৌড় চামড়া পর্যন্ত। কথাটা ডাহা মিথ্যে। শুধু চামড়ায় নয়, নারীর মাংস হাড় মজ্জা সর্বত্রই রূপের সন্ধান করতে হবে।

একটা ফাজিল মেয়ে বললে, চিরে চিরে দেখবেন নাকি সার?

—আরে না না, তোমাদের কোনও ভয় নেই, আমি এক নজরেই ভেতর বার সব টের পাই। যা বলছিলুম শোন। মানুষের যেমন তিন দশা—বাল্য যৌবন জরা, নারীর যৌবনেরও তেমনি তিন দশা—আদ্য মধ্য আর অন্ত্য। এই তিন যৌবনের তোয়াজ বা পরিচর্যার পদ্ধতি আলাদা, প্রসাধন বা মেরামতও এক রকমে হয় না। কি রকম জানেন? মনে করুন একটা ইমারত তৈরী হল। প্রথম পনরো বৎসর তার হেপাজত খুব সোজা, মাঝে মাঝে চুনকাম আর রং ফেরালেই যথেষ্ট। কিন্তু আরও পরে দেখবেন, এক এক জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে, দরজা জানালার রং চটে গেছে। তখন রীতিমত মেরামত করতে হবে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে দেখবেন, স্থানে

স্থানে ভিত বসে গেছে, দেওয়ালে ফাট ধরেছে, ছাত চিড় খেয়েছে। তখন শুধু দাগরাজি নয়, থরো রিপেয়ার দরকার, হয়তো দু-চার জায়গায় পিলপে গেঁথে কড়িতে চাড় দিতে হবে, ফাটা দেওয়াল জুড়তে হবে। ফেস লিফ্‌টিং জানেন? বিলেতে খুব চলন আছে, আমাদের মা-লক্ষ্মীরা কেউ করিয়েছেন কিনা জানি না। বেশী বয়সে গাল ঝুলে পড়লে রগের চামড়া টেনে সেলাই করে দেয়, তাতে যৌবনশ্রী ফিরে আসে। ফাটা দেওয়াল যেমন লোহার প্লেট আর নট-বোল্টু দিয়ে টেনে রাখা হয় সেইরকম আর কি। আসল কথা, আমাদের এই দেহমন্দির একটা ইমারতের সমান, যতদিন খাড়া থাকে ততদিনই তার তোয়াজ করতে হয়। কিন্তু ইমারত পুরনো হলেই বরবাদ হয় না, হাল ফ্যাশনের অনেক বাড়ির চাইতে আমাদের বাপ-পিতামোর আমলের সেকেলে বাড়ি ঢের ভাল। বরনারীও সেইরকমে বিচার করতে হবে। শুধু কম বয়স আর ওপর-চটকে ভুললে চলবে না মশাই, দেখতে হবে বনেদ কেমন, গাঁথনি কেমন, ভূমিকম্প আর ঝড়বৃষ্টির ধকল সইতে পেরেছে কিনা। আচ্ছা, কথা তো বিস্তর বলা হল, এখন ইন্‌স্পেকশন আরম্ভ করা যাক। কই হে সেক্রেটারি, তোমাদের বরমাল্য কই?

কপোত গুহ একটি প্রকাণ্ড মালা এনে বললেন, এই যে সার। রাখহরিবাবু মালাটি হাতে নিয়ে বললেন, বাঃ, খাসা মালাটি, বোধ হয় সের খানিক জুঁই ফুল আছে। বরমাল্য এইরকমই হওয়া উচিত। আজকাল হয়েছে গ্যালভানাইজ তারে

গাঁথা ফুল-পাতার মালা, খ্রীষ্টানরা যেমন কবরে দেয়। এক জায়গায় আমাকে ওইরকম একটা মালা দিয়েছিল, গিন্নী রেগে গিয়ে টান মেরে সেটা ফেলে দিয়েছিলেন।

রাখহরি লাহিড়ী মন্থরগতিতে পরিক্রমণ আরম্ভ করলেন। প্রথমেই ছাত্রীদের দলের কাছে এসে বললেন, বগের মতন গলা বাড়াচ্ছিস কি, তোদের মালা দিচ্ছি না। তোরা হলি কাঁচা কংক্রিট, পোক্ত হতে বহুকাল লাগবে।

একটি মেয়ে চুপি চুপি বললে, দাদু, দয়া করে রাজলক্ষ্মী দেবীর গলায় মালা দিন, ভীষণ মজা হবে।

চোপ বলে ধমক দিয়ে রাখহরি এগিয়ে চললেন। প্রত্যেক মহিলার সামনে এসে একটু থামেন, তার পর আবার চলেন। সভায় চাপা গলায় তুমুল গুঞ্জন আরম্ভ হল। সদস্যরা বলাবলি করতে লাগলেন—বুড়ো কাকে মালা দেবে মনে হচ্ছে? নিশ্চয় হ্লাদিনী দেবীকে—উঃ, কি মারাত্মক কায়দায় শাড়ি পরেছে দেখ। কই না, ওর দিকে একবার তাকিয়েই তো এগিয়ে চলল। ওই দেখ, বঞ্জুলা নিয়োগীকে ঠাউরে দেখছে। নাঃ, বুড়োর পছন্দ কিচ্ছু নেই, ঘাড় নেড়ে আবার চলল। বোধ হয় কলাবতী ভৌমিককে পছন্দ করবে। ওঃ, চুল বাঁধার স্টাইলখানা দেখ। আরে গেল যা, ওকেও তো ফেলে চলে গেল! কাকে মালা দেবে বুড়ো, সুন্দরী আর কই? এই মাটি করলে, রাজলক্ষ্মী দেবীর কাছে থেমেছে, শেষটায় ওকেই মনে ধরল নাকি? নাঃ, একটু হেসে ঘাড় নেড়ে আবার চলেছে।

রাখহরি লাহিড়ী সমস্ত মহিলা পরিদর্শন করে ফিরে আসছেন দেখে কপোত গুহ আর সোহনলাল হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, কি হল সার, মালা দিলেন না?

এই যে দিচ্ছি ভাই—এই বলে রাখহরি হন হন করে তাঁর বসবার জায়গায় ফিরে এসে মৃদু স্বরে বললেন, গিন্নী, মাথাটা তোল। থাকমণি থতমত খেয়ে ঘাড় উঁচু করলেন, রাখহরি ঝুপ করে মালাটি তাঁর গলায় দিলেন।

নিমেষকালমাত্র সমগ্র সভা চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর তিন দিক থেকে তীব্র আলোর ঝলক থাকমণিদেবীর শীর্ণ মুখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ক্যামেরার লেন্স উন্মীলিত হল—ক্লিক ক্লিক ক্লিক। থাকমণি চমকে উঠে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, আঃ, জ্বালিয়ে মারলে, এদের মতলবটা কি, খুন করবে নাকি?

তুমুল করতালির শব্দে সভা যেন ফেটে পড়ল, যেসব মহিলার রূপের খ্যাতি আছে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী হাততালি দিলেন। ছাত্রীর দল হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

হট্টগোল একটু থামলে রাজলক্ষ্মীদেবী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আজকের অনুষ্ঠানটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছে, আমরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছি। মহিলাদের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখহরি লাহিড়ী মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি, তাঁর বরনারীবরণ অনবদ্য হয়েছে। শ্রীযুক্তা থাকমণি দেবী আজ যে দুর্লভ সম্মান পেলেন তার জন্যে তাঁকেও

আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁকে মাল্যদান করে শ্রীলাহিড়ী সমস্ত পুরুষজাতির সমক্ষে একটি সুমহান আদর্শ স্থাপন করেছেন। এই বলে রাজলক্ষ্মীদেবী তাঁর স্বামী বামাপদ ঘোষালের দিকে কটমট করে তাকালেন।

সরসীবালা তাঁর বেহানকে বললেন, কি দিদি, এখন খুশী হয়েছেন তো?

—রাম রাম, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না, বুড়োর বুদ্ধিশুদ্ধি কি একবারে লোপ পেয়েছে! বাড়ি চল বোন, এখানে আর এক দণ্ড নয়, সবাই প্যাঁট প্যাঁট করে তাকাচ্ছে।

১৩৬০

একগুঁয়ে বার্থা

মোগলসরাইএর দু স্টেশন আগে সাকলদিহা। সকাল আটটায় পঞ্জাব মেল সেখানে এসে থামল। একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরায় দশ জন বাঙালী আর অবাঙালী যাত্রী আছেন, গাড়ি চলতে দেরি হচ্ছে দেখে তাঁরা অধীর হয়ে উঠলেন। প্ল্যাটফর্মে কলরব হতে লাগল।

ক্যা হুআ গার্ডসাহেব? গার্ড জানালেন, এঞ্জিন বিগড়ে গেছে, ট্রেন এখন সাইডিংএ ফেলে রাখা হবে, মোগলসরাই থেকে অন্য এঞ্জিন এলে গাড়ি চলবে। অন্তত দেড় ঘণ্টা দেরি হবে।

অতুল রক্ষিত বিরক্ত হয়ে বললেন, বিগড়ে যাবার আর সময় পেলেন না ইঞ্জিন, সেরেফ বজ্জাতি। ই. আই. আর. নাম বদলে গিয়েই এইসব যাচ্ছেতাই কাণ্ড শুরু হয়েছে। কাশী পৌঁছুতে দুপুর পেরিয়ে যাবে দেখছি। ওহে নরেশ, তোমাদের প্লে যদি ভাল না ওতরায় তো আমি দায়ী হব না তা বলে দিচ্ছি। আনাড়ী অ্যাক্টরদের তালিম দিতে অন্তত দশ ঘণ্টা লাগবে। সিরাজুদ্দৌলা নাটকটি সোজা নয়।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, আপনি ভাববেন না রক্ষিত মশায়। ওরা অনেক দিন ধরে রিহার্সাল দিয়ে তৈরী হয়ে আছে, আপনি

শুধু একটু পালিশ চড়িয়ে দেবেন। তিন-চার ঘণ্টার বেশী লাগবে না।

অতুল রক্ষিত বললেন, তাতে কিছুই হবে না, তোমাদের খোট্টাই উচ্চারণ দুরস্ত করতেই দিন কেটে যাবে। দেখ নরেশ, আমার মনে হচ্ছে আমরা অশ্লেষা কি মঘায় যাত্রা করেছি, সকলেই আমাদের পিছনে লেগেছে। হাওড়া আসতে ট্যাক্‌সির টায়ার ফাটল, সিগারেটের দুটো টিন বাড়িতেই পড়ে রইল, ট্রেনে উঠতে হোঁচট খেলুম, এই দেখ গোড়ালি জখম হয়েছে। এখন আবার ইঞ্জিন নড়বেন না বলে গোঁ ধরেছেন।

অধ্যাপক ধীরেন দত্তর শ্বশুরবাড়ী কাশীতে, পুজোর বন্ধে সেখানে চলেছেন। সহাস্যে বললেন, অচেতন পদার্থের এক-গুঁয়েমি সম্বন্ধে একটা ইংরিজী প্রবাদ আছে বটে।

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ কৈলাস গাঙুলী বললেন, জগদীশ বোস তো বলেই দিয়েছেন যে এক টুকরো লোহাও সাড়া দেয়। তার মানে, লোহার চেতনা আছে। রেলের ইঞ্জিন আর মোটর গাড়ি আরও সচেতন।

ধীরেন দত্ত বললেন, তাদের চাইতে একটা পিঁপড়ে ঢের বেশী সচেতন। এঞ্জিন বা মোটর গাড়ির জীবন নেই।

কৈলাস গাঙুলী বললেন, নেই কেন? ইঞ্জিন কয়লা খায়, জল খায়, ধোঁয়া ছাড়ে, ছাই ফেলে, অর্থাৎ কোষ্ঠ সাফ করে। মোটর গাড়িও পেট্রল খায়, তেল খায়, ধোঁয়া ছাড়ে, চার পায়ে

দাপিয়ে বেড়ায়। জীবনের সব লক্ষণই তো বর্তমান, গোঁ ধরবে তা আর বিচিত্র কি।

—হল না গাঙ্গুলী মশায়। মোটর গাড়ি যদি লোহা-পেতল-চুর খেয়ে দেহের ক্ষয় মেরামত করতে পারত, আর মাঝে মাঝে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পিছনের খোপ থেকে একটি বাচ্চা মোটর প্রসব করত তবেই জীবিত বলা চলত। জীবনের লক্ষণ হচ্ছে—আহার গ্রহণ, শরীর পোষণ, মল বর্জন, আর বংশবৃদ্ধি।

—ওহে প্রফেসার, নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছে। তুমি যে সব লক্ষণ বললে তাতে আগুনকেও সজীব পদার্থ বলা চলে। আশপাশ থেকে দাহ্য উপাদান আত্মসাৎ করে পুষ্ট হয়, ধোঁয়া আর ছাই ত্যাগ করে, সুবিধে পেলেই ব্যাপ্ত হয়ে বংশ-বৃদ্ধি করে।

ধীরেন দত্ত হেসে বললেন, হার মানলুম গাঙ্গুলী মশায়। কিন্তু এঞ্জিনের বা আগুনের গোঁ আছে এ কথা মানি না।

—জোর করে কিছুই বলা যায় না, জগৎটাই যে প্রাণময়।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক কোণে হেলান দিয়ে চোখ বুজে সব কথা শুনছিলেন। মাথায় টাক, বড় গোঁফ, কপালে একটা কাটা দাগ, চোখে পুরু চশমা। ইনি খাড়া হয়ে বসে বললেন, মশায়রা যদি অনুমতি দেন তো একটা কথা নিবেদন করি। আমি একটা মোটর গাড়ি জানি যার অতি ভয়ানক গোঁ ছিল। আমার নিজেরই গাড়ি, জার্মান বার্থা কার।

অতুল রক্ষিত বললেন, ব্যাপারটা খুলে বলুন সার।

দু হাতের আস্তিন গুটিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এই দেখুন কি রকম চোট লেগেছিল। কপালের কাটা দাগ তো দেখতেই পাচ্ছেন। শুধু জখম হইনি মশায়, বিনা অপরাধে কোর্টে হাজারটি টাকা জরিমানা দিয়েছি। সবই সেই বার্থা গাড়ির একগুঁয়েমির ফল।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, আপনারই তো গাড়ি, তবে আপনার ওপর তার অত আক্রোশ হল কেন? বেদম চাবুক লাগিয়েছিলেন বুঝি?

—তামাশা করবেন না মশায়। আক্রোশ আমার ওপর নয়, মকদুমপুরের কুমার সাহেবের ওপর। তিনি খুন হলেন, আমি জখম হলুম, আর অসাবধানে গাড়ি চালিয়ে মানুষ মেরেছি এই মিথ্যে অপবাদে মোটা টাকা দণ্ড দিলুম। আমি হচ্ছি মাখনলাল মল্লিক, আমার কেসটা কাগজে পড়ে থাকবেন।

কৈলাস গাঙুলী বললেন, মনে পড়ছে না কি হয়েছিল। ঘটনাটা সবিস্তারে বলুন মল্লিক মশায়। ইঞ্জিন এসে পৌঁছুতে তো ঢের দেরি, ততক্ষণ আপনার আশ্চর্য কাহিনীটি শোনা যাক।

মাখন মল্লিক বলতে লাগলেন।—

আমি শেয়ারের দালালি করি, শহরে হরদম ঘুরে বেড়াতে হয়। পনর বছর আগেকার কথা। জগমল সেথিয়া পুরানো মোটর গাড়ির ব্যবসা করে। একদিন আমাকে বললে,

বাবুজী, একটা ভাল গাড়ি নেবেন? জার্মান বার্থা কার, রোল্‌স রয়েস তার কাছে লাগে না, সস্তায় দেব। গাড়িটি দেখে আমার খুব পছন্দ হল। বেশী দিন ব্যবহার হয় নি, কিন্তু দেখেই বোঝা যায় যে বেশ জখম হয়েছিল, সর্বাঙ্গে চোট লাগার চিহ্ন আছে। তা হলেও গাড়িটি অতি চমৎকার, মেরামতও ভাল করে হয়েছে। জগমল খুব কম দামেই বেচলে, সাড়ে তিন হাজারে পেয়ে গেলুম।

একদিন স্টক এক্সচেঞ্জে যাচ্ছি, ড্রাইভার নেই, নিজেই চালাচ্ছি। যাব দক্ষিণ দিকে, কিন্তু স্টিয়ারিংএর ওপর হাতটা যেন কেউ জোর করে ঘুরিয়ে দিলে, গাড়ি উত্তর দিকে চলল। সামনে একটা প্রকাণ্ড গাড়ি আস্তে আস্তে চলছিল, আমার বার্থা কার পিছন থেকে তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে, প্রাণপণে ব্রেক কষেও সামলাতে পারলুম না।

যখন জ্ঞান হল, দেখলুম আমি রক্ত মেখে শুয়ে আছি, মাথা আর হাতে যন্ত্রণা, চারিদিকে পুলিস। আমাকে মেডিক্যাল কলেজে ড্রেস করিয়ে থানায় নিয়ে গেল। শুনলুম ব্যাপারটা এই।—আমার গাড়ি যাকে ধাক্কা মেরেছিল সেটা হচ্ছে মকদুমপুরের কুমার সাহেবের গাড়ি। গাড়িখানা একবারে চুরমার হয়েছে, একটা গ্যাস পোস্টে ঠুকে গিয়ে কুমার সাহেবের মাথা ফেটে গেছে, বাঁচবার কোনও আশা নেই। আমি বেহুঁশ হয়ে গাড়ি চালিয়ে মানুষ খুন করেছি এই অপরাধে পুলিস আমাকে গ্রেফতার করেছে। অনেক কষ্টে বেল দিয়ে খালাস পেলুম।

তার পর তিন মাস ধরে মকদ্দমা চলল। সরকারী উকিল বললে, আসামী মদ খেয়ে চুর হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমার ব্যারিস্টার বললে, মাখন মল্লিক অতি সচ্চরিত্র লোক, মোটেই নেশা করে না, হঠাৎ মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে অসামাল হয়েছিল।

কৈলাস গাঙ্গুলী প্রশ্ন করলেন, আপনার মৃগীর ব্যারাম আছে নাকি?

—না মশায়, মৃগী কস্মিন্ কালে হয় নি, মদ গাঁজা গুলিও খাই নি। আমাকে ফাঁসাবার জন্যে সরকারী উকিল আর বাঁচাবার জন্যে আমার ব্যারিস্টার দুজনেই ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিল। প্রকৃত ব্যাপার—বার্থা গাড়ি নিজেই চড়াও হয়েছিল, আমার তাতে কিছুমাত্র হাত ছিল না। কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করবে? আমি নিস্তার পেলুম না, হাজার টাকা জরিমানা হল, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সও বাতিল হয়ে গেল।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, কুমার সাহেবের গাড়িটা কোন্ মেক ছিল?

—খুব দামী ব্রিটিশ গাড়ি, সোআংক্-টুটলার।

—তাই বলুন। আপনার জার্মান গাড়ি তো ব্রিটিশ গাড়িকে ঢু মারবেই, শত্রুর তৈরী যে। মজা মন্দ নয়, দুই চ্যাম্পিয়ান গাড়ির লড়াই হল, মাঝে থেকে বেচারা কুমার বাহাদুর মরলেন, আপনি জখম হলেন, আবার জরিমানাও দিলেন।

মাখন মল্লিক বললেন, যা ভাবছেন তা নয় মশায়, এতে ইণ্টারন্যাশনাল ক্ল্যাশের নাম গন্ধ নেই। আসল কথা, বার্থা গাড়ি প্রতিশোধ নিয়েছে, কুমার সাহেবকে ডেলিবারেটলি খুন করেছে।

কৈলাস গাঙ্গুলী বললেন, বড়ই অলৌকিক কথা, কলি-যুগেও কি এমন হয়? অবশ্য জগতে অসম্ভব কিছু নেই। আপনার এই বিশ্বাসের কারণ কি?

এই সময় কামরায় একটা ধাক্কা লাগল, তার পরেই হেঁচকা টান। অতুল রক্ষিত বললেন, যাক বাঁচা গেল, ইঞ্জিন খুব চটপট এসে গেছে, সাড়ে দশটার মধ্যে কাশী পেঁছে যাব।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, কাশী বিশ্বনাথ এখন মাথায় থাকুক। মল্লিক মশায়, আপনার গল্পটি শেষ করে ফেলুন, নইলে গাড়ি থেকে নামতে পারব না।

মাখন মল্লিক বললেন, তার পর শুনুন। আমার মাথার আর হাতের ঘা সেরে গেল, মকদ্দমাও চুকে গেল। তখন আমার মনে একটা জেদ চাপল। বার্থা গাড়ির আচরণটি বড়ই অদ্ভুত, তার রহস্য ভেদ না করলে স্বস্তি পাব না। প্রথমেই খোঁজ নিলুম জগমল সেঠিয়ার কাছে। সে বললে, এই গাড়ির মালিক ছিলেন সলিসিটার জলদ রায়, রায় অ্যাণ্ড দস্তিদার ফার্মের পার্টনার। রাঁচি যেতে যেতে চাণ্ডিলের কাছে তাঁর গাড়ি উলটে যায়। তাঁর বন্ধু কুমার বাহাদুর নিজের গাড়িতে আগে আগে যাচ্ছিলেন, তিনিই অতি কষ্টে জলদ রায় আর

তাঁর স্ত্রীকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনেন। জলদ রায় সাত দিন পরে মারা গেলেন, তাঁর স্ত্রী ভাঙা বার্থা গাড়ি জগন্মলকে বেচলেন, মেরামতের পর সে আবার আমাকে বেচলে।

কৈলাস গাঙ্গুলী বললেন, মানুষ মারাই দেখছি বার্থা গাড়িটার স্বভাব।

না মশায়, জলদ রায়কে বার্থা মারে নি। জগন্মল আর কোনও খবর দিতে পারলে না, তখন আমি জলদ রায়ের স্ত্রীর কাছে গেলুম। তিনি বাপের বাড়িতে ছিলেন, একবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করা বৃথা। তার পর গেলুম জলদের পার্টনার রমেশ দস্তিদারের কাছে। শেয়ার কেনা বেচা উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। প্রথমটা তিনি কিছুই বলতে চাইলেন না। যখন শুনলেন বার্থা গাড়িই কুমার সাহেবকে মেরেছে তখন অবাক হয়ে গেলেন এবং নিজে যা জানতেন তা প্রকাশ করলেন। মারা যাবার আগে জলদ রায় তাঁকে সবই জানিয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলছি শুনুন।

জলদ রায় বিস্তর পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলেন। সলিসিটার ফার্মের কাজ দস্তিদারই দেখতেন, জলদ রায় ফুর্তি করে বেড়াতেন আর নিয়মরক্ষার জন্য মাঝে মাঝে অফিসে যেতেন। তাঁর স্ত্রী হেলেনা রায় ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী আর বিখ্যাত সোসাইটি লেডি।

কৈলাস গাঙ্গুলী বললেন, ও, তাই বলুন, এর মধ্যে একজন সুন্দরী নারী আছেন, নইলে অনর্থ ঘটবে কেন।

—জলদ রায়ের সঙ্গে মকদুমপুরের কুমার ইন্দ্রপ্রতাপ সিংএর খুব বন্ধুত্ব ছিল। ইন্দ্রপ্রতাপ বিলিতী সোআংক্-টুটলার গাড়ি কিনলেন দেখে জলদ রায় বললেন, আমি লেটেস্ট মডেল জার্মন বার্থা কার কিনছি। তোমার গাড়ি বড়, কিন্তু স্পীডে বার্থার কাছে হেরে যাবে।

কুমার সাহেব বললেন, তবে এস, একদিন রেস লাগানো যাক, পাঁচ হাজার টাকা বাজি। জলদ রায় বললেন, রাজী আছি। আমার বাড়ি থেকে স্টার্ট করা যাবে। বেলা একটার সময় তুমি রওনা হবে, তার ঠিক পনর মিনিট পরে আমি হেলেনাকে নিয়ে বেরুব। চাণ্ডিলের আগেই তোমাকে ধরে ফেলব। কুমার সাহেব বললেন, খুব ভাল কথা। চাণ্ডিল ডাকবাংলায় আমরা রাত কাটাব, পরদিন সকালে একসঙ্গে রাঁচি যাব, সেখানে আমার বাড়িতে পিকনিক করা যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে জলদ রায় তাঁর অফিস থেকে বেলা পৌনে একটায় ফিরে এলেন। স্ত্রীকে দেখতে পেলেন না, দারোয়ান বললে, কুমার বাহাদুর এসেছিলেন, তাঁর গাড়িতে মেমসাহেবকে তুলে নিয়ে এইমাত্র রওনা হয়েছেন। এই চিঠি রেখে গেছেন।

চিঠিটা জলদ রায়ের স্ত্রী লিখেছিলেন। তার মর্ম এই।—কুমারের সঙ্গে চললুম, জীবনটা পরিপূর্ণ করতে চাই। লক্ষ্মীটি, তুমি আর শুধু শুধু পিছনে ধাওয়া ক'রো না। ডিভোর্সের দরখাস্ত কর, ইন্দ্রপ্রতাপ কৃপণ নয়, উপযুক্ত খেসারত দেবে। হেলেনা।

জলদ রায়ের মাথায় খুন চাপল। স্ত্রীর জন্যে একটা চাবুক, কুমারের জন্যে একটা মাউজার পিস্তল, নিজের জন্যে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি, আর বার্থার জন্যে তিন বোতল সাজাহানপুর রম নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ি কেনার পরেই তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে বার্থাকে রম খাওয়ালে, (অর্থাৎ পেট্রল ট্যাংকে রম ঢাললে) তার বেশ ফুর্তি হয়, হর্স-পাওয়ার বেড়ে যায়।

প্রচণ্ড বেগে গাড়ি চালিয়ে জলদ রায় যখন চাণ্ডিলের কাছে পৌঁছুলেন তখন দেখতে পেলেন প্রায় দেড় মাইল দূরে কুমারের গাড়ি চলেছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, কিন্তু দূর থেকে সোআংক্-টুটলারের রুপুলী রং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে কুমার ইন্দ্রপ্রতাপও দেখলেন পিছনে একটা গাড়ি ছুটে আসছে। তিনটে হেড লাইট দেখেই বুঝলেন যে জলদ রায়ের বার্থা কার। কুমারের সামনেই একটা পাহাড়, রাস্তা তার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে। তিনি জোরে গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ের আড়ালে এলেন, এবং গাড়ি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি গোটাকতক বড় বড় পাথরের চাঙড় রাস্তায় রাখলেন। তার পর আবার গাড়িতে উঠে চললেন।

সঙ্গে সঙ্গে বার্থা গাড়ি এসে পড়ল। জলদ রায় বিস্তর মদ খেয়েছিলেন, বার্থাকেও খাইয়েছিলেন, তার ফলে দুজনেই একটু টলছিলেন। রাস্তার বাধা জলদ দেখতে পেলেন না, পাথরের ওপর দিয়েই পুরো জোরে চালালেন। ধাক্কা খেয়ে

বার্থা গাড়ি কাত হয়ে পড়ে গেল। ইন্দ্রপ্রতাপের ইচ্ছে ছিল তাড়াতাড়ি অকুস্থল থেকে দূরে সরে পড়বেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গিনী হেলেনা চিৎকার করতে লাগলেন, দৈবক্রমে একটা মোটর গাড়িও বিপরীত দিক থেকে এসে পড়ল। তাতে ছিলেন ফরেস্ট অফিসার বনবিহারী দুবে আর তাঁর চাপরাসী।

অগত্যা ইন্দ্রপ্রতাপকে থামতে হল। তিনি দুবের সাহায্যে জলদ রায়কে তুলে নিয়ে চাণ্ডিল হাসপাতালে এলেন। ডাক্তার বললেন, সাংঘাতিক জখম, আমি মরফীন ইঞ্জেকশন দিচ্ছি, এখনই কলকাতায় নিয়ে যান। দুবেজী বললেন, কুমার সাহেব, আপনি আর দেরি করবেন না, এঁদের নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আপনার বন্ধুর গাড়িটা আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। চেক বই সঙ্গে আছে তো? একখানা সাড়ে সাত হাজার টাকার বেয়ারার চেক লিখে দিন, পুলিসকে ঠাণ্ডা করতে হবে।

কলকাতায় ফেরবার সাত দিন পরেই জলদ রায় মারা পড়লেন, তাঁর স্ত্রী হেলেনা উন্মাদ অবস্থায় বাপের বাড়ি চলে গেলেন। তোবড়ানো বার্থা গাড়িটা জগমল কিনে নিলে।

এখন ব্যাপারটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হল তো? ইন্দ্রপ্রতাপ বার্থাকে জখম করেছে, তার প্রিয় মনিবকে খুন করেছে, বার্থা এরই প্রতিশোধ খুঁজছিল। অবশেষে আমার হাতে এসে তার মনস্কামনা পূর্ণ হল, স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে সোআংক্-টুটলারকে ধাক্কা দিয়ে চুরমার করে দিলে, ইন্দ্র-প্রতাপকেও মারলে।

ধীরেন দত্ত বললেন, বার্থা খুব পতিব্রতা গাড়ি, তার আগেকার মনিবের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে, কিন্তু আপনার ওপর তার টান ছিল না দেখছি। শত্রু মারতে গিয়ে আপনাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বার্থার গতি কি হল?

—জগন্মলকেই বেচে দিয়েছি, চার শ টাকায়।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, খাসা গল্পটি মাখনবাবু, কিন্তু বড্ড তড়বড় করে বলেছেন। যদি বেশ ফেনিয়ে আর রসিয়ে পাঁচ শ পাতার একটি উপন্যাস লিখতে পারেন তবে আপনার রবীন্দ্র-পুরস্কার মারে কে। যাই হক, বেশ আনন্দে সময়টা কাটল।

—আনন্দে কাটল কি রকম? দু জন নামজাদা লোক খুন হল, এক জন মহিলা উন্মাদ হয়ে গেল, দুটো দামী গাড়ি ভেঙে গেল, আমি জখম হলুম আবার জরিমানাও দিলুম, এতে আনন্দের কি পেলেন?

—রাগ করবেন না মাখনবাবু। আপনি জখম হয়েছেন, জরিমানা দিয়েছেন, তার জন্যে আমরা সকলেই খুব দুঃখিত—কি বলেন গাঙুলী মশায়? কুমার সাহেবকে বধ করে আপনি ভালই করেছেন, কিন্তু জলদ রায়কে মরতে দিলেন কেন? সে কলকাতায় ফিরে এল, হেলেনা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তার সেবা করলে, জলদ সেরে উঠল, তার পর ক্ষমাঘেন্না করে দু

জনে মিলে মিশে সংখে ঘরকন্না করতে লাগল—এইরকম হলে আরও ভাল হত না কি?

—আপনি কি বলতে চান আমি একটা গল্প বানিয়ে বলেছি? আপনারা দেখছি অতি নিষ্ঠংর বেদরদী লোক।

মোগলসরাই এসে পড়ল। মাখন মল্লিক তাঁর বিছানার বাণ্ডিলটা ধপ করে প্ল্যাটফর্মে ফেললেন এবং সংটকেসটি হাতে নিয়ে নেমে পড়ে বললেন, অন্য কামরায় যাচ্ছি, নমস্কার।

কৈলাস গাঙংলী বললেন, ভদ্রলোককে তোমরা শংধং শংধং চটিয়ে দিলে। আহা, চোট খেয়ে বেচারার মাথা গংলিয়ে গেছে।

১৩৬০

পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী

পঞ্চপাণ্ডব অত্যন্ত অশান্তিতে আছেন। ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বার বৎসর বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে এজন্য নয়। এই কাল উত্তীর্ণ হলেও হয়তো দুর্যোধন রাজ্য ফেরত দেবেন না, তখন আত্মীয় কৌরব-দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এজন্যও নয়। অশান্তির কারণ, পাঞ্চালী এক মাস তাঁর পঞ্চপতির সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন।

রাজ্যত্যাগের পর পাণ্ডবরা প্রথমে কাম্যকবনে এসেছিলেন, এখন দ্বৈতবনে নদীর তীরে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করছেন। তাঁদের সঙ্গে পুরোহিত ধৌম্য এবং আরও অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, সারথি ইন্দ্রসেন এবং অন্যান্য দাসদাসী আছে, দ্রৌপদীর সহচরী ধাত্রীকন্যা বালিকা সেবন্তী আছে। দ্রৌপদীর বিস্তর কাজ, বনবাসেও তাঁকে বৃহৎ সংসার চালাতে হয়। ভগবান সূর্যের দয়ায় তিনি যে তামার হাঁড়িটি পেয়েছেন তাতে রান্না সহজ হয়ে গেছে, দ্রৌপদীর না খাওয়া পর্যন্ত খাদ্য আপনিই বেড়ে যায়, সহস্র লোককে পরিবেশন করলেও কম পড়ে না। গৃহিণীর সকল কর্তব্যই দ্রৌপদী পালন করছেন, শুধু স্বামীদের সঙ্গে কথা বলেন না। কোনও অভাব হলে সেবন্তীই তা পাণ্ডবদের জানায়।

পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী

প্রায় চার মাস হল পাণ্ডবরা বনবাসে আছেন। এ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির প্রসন্ন মনে দিনযাপন করছিলেন, যেন বনবাসেই তিনি আজীবন অভ্যস্ত। ভীম প্রথম প্রথম কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরে বেশ প্রফুল্ল হয়ে মৃগয়া নিয়েই থাকতেন। অর্জুন নকুল সহদেবও রাজ্যনাশের দুঃখ ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পাঞ্চালীর ভাবান্তর দেখে পাঁচজনেই উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

দ্যূতসভায় অপমান আর রাজ্যনাশের দুঃখ দ্রৌপদী ভুলতে পারেন নি। তিনি প্রায়ই বিলাপ করতেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পতির নির্বুদ্ধিতা এবং অন্যান্য পতির অকর্মণ্যতার জন্যই এই দুর্দশায় পড়তে হয়েছে। যুধিষ্ঠির তাঁকে শান্ত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, ভীম বার বার আশ্বাস দিয়েছেন যে দুঃশাসনের রক্তপান আর দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ না করে তিনি ছাড়বেন না, অর্জুন নকুল সহদেবও তাঁকে বহুবার বলেছেন যে ত্রয়োদশ বর্ষ দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তার পর আবার সুদিন আসবে। কিন্তু কোনও ফল হয় নি, দ্রৌপদী তাঁর রোষ দমন করতে না পেরে অবশেষে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছেন।

দ্বৈতবন থেকে দ্বারকা বহু দূর, তথাপি কৃষ্ণ রথে চড়ে মাঝে মাঝে পাণ্ডবদের দেখতে আসেন, দু-একবার সত্যভামাকেও সঙ্গে এনেছেন। এবারে তিনি একাই এসেছেন।

যুধিষ্ঠিরের কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর গৃহে এলেন।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মামাতো ভাই, অর্জুনের সমবয়স্ক। সেকালে বউদিদি আর বউমার অনুরূপ কোনও সম্বোধন ছিল কিনা জানা যায় না। থাকলেও তার বাধা ছিল, কারণ সম্পর্কে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর ভাশুরও বটেন দেওরও বটেন। দ্রৌপদীর প্রকৃত নাম কৃষ্ণা, সেজন্য কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে সখীসম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন এবং দুজনেই পরস্পরকে নাম ধরে ডাকতেন।

অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, সখী কৃষ্ণা, তোমার চন্দ্রবদন রন্ধনশালার হণ্ডিকার ন্যায় দেখাচ্ছে কেন?

দ্রৌপদী বললেন, কৃষ্ণ, সব সময় পরিহাস ভাল লাগে না।

কৃষ্ণ বললেন, তোমার কিসের দুঃখ? পাণ্ডবরা তোমার কোন্ অভাব পূর্ণ করতে পারছেন না তা আমাকে বল। সূক্ষ্ম কৌষেয় বস্ত্র আর রত্নাভরণ চাও? গন্ধদ্রব্য চাও? এখানে শস্য দুর্লভ, তোমরা মৃগয়ালব্ধ মাংস আর বন্য ফল মূল শাকাদি খেয়ে জীবনধারণ করছ, তাতে অরুচি হবার কথা, তার ফলে মনও অপ্রসন্ন হয়। যব গোধূম তণ্ডুল মুদ্গাদি চাও? দুগ্ধবতী ধেনু চাও? ঘৃত তৈল গুড় লবণ হরিদ্রা আর্দ্রক চাও? দশ-বিশ কলস উত্তম আসব পাঠিয়ে দেব? পৈষ্টী মাধ্বী আর গৌড়ী মদিরা, মৈরেয় আর দ্রাক্ষেয় মদ্য,

সবই দ্বারকায় প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে বোধ হয় তালরস ভিন্ন কিছুই মেলে না।

দ্রৌপদী হাত নেড়ে বললেন, ওসব কিছুই চাই না। মাধব, তুমি তো মহাপণ্ডিত, লোকে তোমাকে সর্বজ্ঞ বলে। আমার দুর্ভাগ্যের কারণ কি তা বলতে পার? আমার তুল্য হতভাগিনী আর কোথাও দেখেছ?

কৃষ্ণ বললেন, বিস্তর, বিস্তর। আমার যে-কোনও পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলে শুনবে তিনিই অদ্বিতীয়া হতভাগিনী, অনুপমা দগ্ধকপালিনী। তাঁরা মনে করেন আমিই তাঁদের সমস্ত আধিদৈবিক আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক দুঃখের কারণ। কৃষ্ণা, দুশ্চিন্তা দূর কর। বিধাতা বিশ্বপাতা মঙ্গলদাতা করুণাময়।

—তুমি বিধাতার চাটুকার, তাঁর নিষ্ঠুরতা দেখেও দেখছ না, কেবল করুণাই দেখছ।

—যাজ্ঞসেনী, তুমি কেবল নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাবছ কেন, সৌভাগ্যও স্মরণ কর। তুমি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজমহিষী, তোমার তুল্য গৌরবময়ী নারী আর কে আছে? তোমার বর্তমান দুর্দশা চিরদিন থাকবে না, আবার তুমি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবে। যজ্ঞের অনল থেকে তোমার উৎপত্তি, তুমি অপূর্ব রূপবতী, তোমার পিতা পঞ্চালরাজ দ্রুপদ বর্তমান আছেন, তোমার দুই মহাবল ভ্রাতা আছেন। তোমার পাঁচ বীরপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে দ্বারকায় আমাদের ভবনে শিক্ষালাভ

করছে। পাঁচ পুরুষসিংহ তোমার স্বামী, চার ভাশুর, চার দেবর—

—ভাশুর দেবর আবার কোথায় পেলে? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

—ভাশুর আর দেবর তোমার কাছেই আছেন। কৃষ্ণা, এই শ্লোকটি কি তুমি শোন নি?—

পতিশ্বশুরতা জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতানুজে।
মধ্যমেষু চ পাঞ্চাল্যাস্ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং ত্রিষু॥

—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব পাঞ্চালীর পতি ও ভ্রাতৃশ্বশুর (ভাশুর), কনিষ্ঠ পাণ্ডব পতি ও দেবর, মাঝের তিনজন প্রত্যেকেই পতি ভাশুর ও দেবর।

—তাতেই আমি ধন্য হয়ে গেছি?

—পাঞ্চালী, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। দোষশূন্য মানুষ জগতে নেই, যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয় ও সরলস্বভাব, তাই এই বিপদ হয়েছে। তিনি অনুতপ্ত, তাঁকে আর মনঃপীড়া দিও না। তোমার অন্য পতিরা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ, অগ্রজের মতের বিরুদ্ধে তাঁরা যেতে পারেন না। তাঁদের অকর্মণ্য মনে ক'রো না।

কৃষ্ণ আরও অনেক প্রবোধবাক্য বললেন, নানা শাস্ত্র থেকে ভার্যার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, কিন্তু পাঞ্চালীর ক্ষোভ দূর হল না। তখন কৃষ্ণ স্মিতমুখে বিদায় নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে গেলেন।

একটি প্রকাণ্ড আটচালায় পুরোহিত ধৌম্য আর অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। কৃষ্ণের আগমন উপলক্ষ্যে সেখানে একটি মন্ত্রণাসভা বসেছে। যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা কৃষ্ণকে সাদরে সেই সভায় নিয়ে গেলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, পূজ্যপাদ ধৌম্য ও উপস্থিত বিপ্রগণ, আপনারা সকলে অবধান করুন। বাসুদেব কৃষ্ণ, তুমিও শোন। কৌরবসভায় লাঞ্ছনা ও রাজ্যনাশের শোকে পাঞ্চালীর চিত্ত-বিকার হয়েছে, পঞ্চপতির প্রতি তাঁর নিদারুণ অভিমান জন্মেছে, তিনি এক মাস আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নি। এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার কোন্ উপায়ে হতে পারে তা আপনারা নির্ধারণ করুন।

ধৌম্য বললেন, আমি বেদ পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধার করে পাঞ্চালীকে পতিব্রতা সহধর্মিণীর কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি, পাপের ভয়ও দেখাতে পারি।

কৃষ্ণ বললেন, দ্বিজবর, তাতে কিছুই হবে না। আমি এইমাত্র তাঁকে বিস্তর শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিয়ে এখানে এসেছি, আমার চেষ্টায় কোনও ফল হয় নি।

যুধিষ্ঠির বললেন, তবে উপায়?

পুরোহিত ধৌম্যের খুল্লতাত হৌম্য নামক এক তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, পাঞ্চালীকে বিনীত করা মোটেই দুরূহ নয়। পাণ্ডবগণ স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছেন, দ্রুপদনন্দিনীকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছেন, পঞ্চ ভ্রাতা তাঁদের এই যৌথ কলত্রটিকে ভয়

করেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, আমি অতি সুসাধ্য উপায় বলছি শুনুন। পাঞ্চালীই আপনাদের একমাত্র পত্নী নন। আপনার আর একটি নিজস্ব পত্নী আছেন, রাজা শৈব্যের কন্যা দেবিকা। ভীমের আরও তিন পত্নী আছেন, রাক্ষসী হিড়িম্বা, শল্যের ভগিনী কালী, কাশীরাজকন্যা বলন্ধরা। অর্জুনেরও তিন পত্নী আছেন, মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা, নাগকন্যা উলূপী, আর কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা। নকুলের আর এক পত্নী আছেন, চেদিরাজকন্যা করেণুমতী। সহদেবেরও আর এক পত্নী আছেন, জরাসন্ধকন্যা, তাঁর নামটি আমার মনে নেই। পাঞ্চালীর এই ন জন সপত্নীকে সত্বর এখানে আনবার ব্যবস্থা করুন। তাঁদের আগমনে দ্রৌপদীর অহংকার দূর হবে, আপনারাও বহু পত্নীর সহিত মিলিত হয়ে পরমানন্দে কালযাপন করবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, তপোধন, আপনার প্রস্তাব অতি গর্হিত। দ্রৌপদী বহু মনস্তাপ ভোগ করেছেন, আরও দুঃখ কি করে তাঁকে দেব? আমাদের অনেক ভার্যা আছেন তা সত্য, কিন্তু তাঁরা কেউ সহধর্মিণী পট্টমহিষী নন। আমরা এই যে বনবাসব্রত পালন করছি এতে পাঞ্চালী ভিন্ন আর কেউ আমাদের সঙ্গিনী হতে পারেন না। কৃষ্ণ, সকল আপদে তুমিই আমাদের সহায়, পাঞ্চালী যাতে প্রকৃতিস্থ হন তার একটা উপায় কর।

একটু চিন্তা করে কৃষ্ণ বললেন, ধর্মরাজ, আমি যথোচিত ব্যবস্থা করব। আজ আমাকে বিদায় দিন, আমার এক মাতুল

রাজর্ষি রোহিত এই দ্বৈতবনের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে বানপ্রস্থ আশ্রমে বাস করেন। আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে দু দিনের মধ্যে ফিরে আসব।

রথে উঠে কৃষ্ণ তাঁর সারথি দারুককে বললেন, এখান থেকে কিছু উত্তরে জ্বলজ্জট ঋষির আশ্রম আছে, সেখানে চল।

ঋষির বয়স পঞ্চাশ। তাঁর দেহ বিশাল, গাত্রবর্ণ আরক্ত গৌর, জটা ও শ্মশ্রু অগ্নিশিখার ন্যায় অরুণবর্ণ, সেজন্য লোকে তাঁকে জ্বলজ্জট বলে। কৃষ্ণকে সাদরে অভিনন্দন করে তিনি বললেন, জনার্দন, তিন বৎসর পূর্বে প্রভাসতীর্থে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, ভাগ্যবশে আজ আবার মিলন হল। তোমার কোন্ প্রিয়কার্য সাধন করব তা বল।

কৃষ্ণ বললেন, তপোধন, আমার আত্মীয় ও পরম প্রীতি-ভাজন পাণ্ডবগণ রাজ্যচ্যুত হয়ে দ্বৈতবনে বাস করছেন। সম্প্রতি তাঁরা আর এক সংকটে পড়েছেন, তা থেকে তাঁদের মুক্ত করবার জন্য আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনার পরিচিতা কোনও নারী নিকটে আছে?

জ্বলজ্জট বললেন, নারী ফারী আমার নেই, আমি অকৃত-দার। এই বিজন অরণ্যে নারী কোথায় পাব? তবে হাঁ, অপ্সরা পঞ্চচূড়া মাঝে মাঝে তত্ত্বকথা শুনতে আমার কাছে আসে বটে। সে কিন্তু সুন্দরী নয়।

কৃষ্ণ বললেন, সুন্দরীর প্রয়োজন নেই। পঞ্চচূড়া চিৎকার

করতে পারে তো? তা হলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এখন আমার প্রার্থনাটি শুনুন।

কৃষ্ণ সবিস্তারে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। জহ্নুজট অট্টহাস্য করে বললেন, বাসুদেব, লোকে তোমাকে কুচক্রী বলে, কিন্তু আমি দেখছি তুমি সুচক্রী, তোমার উদ্দেশ্য সাধু। নিশ্চিন্ত থাক, তোমার অনুরোধ নিশ্চয়ই রক্ষা করব। দু দিন পরে অপরাহ্ণকালে আমি পাণ্ডবদের আশ্রমে উপস্থিত হব।

প্রণাম করে কৃষ্ণ বিদায় নিলেন এবং আরও উত্তরে যাত্রা করে রাজর্ষি রোহিতের আশ্রমে এলেন। ইনি বলদেবজননী রোহিণীর ভ্রাতা, বানপ্রস্থ অবলম্বন করে সস্ত্রীক অরণ্যবাস করছেন। কৃষ্ণকে দেখে প্রীত হয়ে বললেন, বৎস, বহুকাল পরে তোমাকে দেখছি। তুমি এখানে কিছুদিন অবস্থান করে তোমার মাতুলানী ও আমার আনন্দবর্ধন কর। দ্বারকার সব কুশল তো?

কৃষ্ণ বললেন, পূজ্যপাদ মাতুল, সমস্তই কুশল। আমি আপনাদের চরণদর্শন করতে এসেছি, দীর্ঘকাল থাকতে পারব না, দু দিন পরেই বিশেষ প্রয়োজনে পাণ্ডবাশ্রমে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

পাণ্ডবগণের পোষ্যবর্গ প্রায় দু শ, প্রতিদিন দু বেলা এই সমস্ত লোকের আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। দ্বৈতবনে হাটবাজার নেই, তণ্ডুলাদি শস্য পাওয়া যায় না, কালে ভদ্রে দরদ

পুক্কশ প্রভৃতি প্রত্যন্তবাসীরা কিছু যব আর মধু এনে দেয়। মৃগয়ালব্ধ পশুর মাংস এবং স্বচ্ছন্দবনজাত ফল মূল ও শাকই পাণ্ডবগণের প্রধান খাদ্য।

প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেই পঞ্চপাণ্ডব মৃগয়ায় নির্গত হন। আজ একটি বৃহৎ বরাহ দেখে তাঁরা উৎফুল্ল হলেন, কারণ বরাহমাংস তাঁদের আশ্রিত বিপ্রগণের অতিশয় প্রিয়। অর্জুন শরাঘাত করলেন, কিন্তু বিদ্ধ হয়েও বরাহ মরল না, বেগে ধাবিত হয়ে নিবিড় অরণ্যে গেল। তখন পঞ্চপাণ্ডব সকলেই শরমোচন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে আর্তনাদ উঠল—হা নাথ, হতোঽস্মি!

তাঁদের শরাঘাতে কি স্ত্রীহত্যা হল? পাণ্ডবগণ ব্যাকুল হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, বরাহ গতপ্রাণ হয়ে পড়ে আছে কিন্তু আর কেউ নেই। চতুর্দিকে অন্বেষণ করেও তাঁরা কিছু দেখতে পেলেন না। ভীম বললেন, নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া, মারীচ এইপ্রকার চিৎকার করে শ্রীরামকে বিভ্রান্ত করেছিল।

যুধিষ্ঠির শঙ্কিত হয়ে বললেন, আশ্রমে শীঘ্র ফিরে চল, জানি না কোনও বিপদ হল কিনা। ভীম, তুমি বরাহটাকে কাঁধে নাও।

সকলে আশ্রমে এসে দেখলেন কোনও বিপদ ঘটে নি। পাঞ্চালী সূর্যদত্ত তাম্রস্থালীতে বরাহমাংস পাক করলেন, সকলেই প্রচুর পরিমাণে ভোজন করে পরিতৃপ্ত হলেন।

অপরাহ্নকালে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ তরুর তলে সকলে বসেছেন, পুরোহিত ধৌম্য যম-নচিকেতার উপাখ্যান বলছেন। পাঞ্চালীও একটু পশ্চাতে বসে সেই পবিত্র কথা শুনছেন। এমন সময় মূর্তিমান বিপদ রূপে জ্বলজ্জট ঋষি উপস্থিত হলেন। তাঁর জটা ও শ্মশ্রু অগ্নিজ্বালার ন্যায় ভয়ংকর, মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ, চক্ষু বিস্ফারিত ও ভ্রূকুটিকুটিল। হুংকার করে জ্বলজ্জট বললেন, ওরে রে নারীঘাতক পাপিবৃন্দ, আজ ব্রহ্মশাপে তোমাদের নরকে প্রেরণ করব!

যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমরা কোন্ মহাপাপ করেছি?

জ্বলজ্জট উত্তর দিলেন, তোমরা শরাঘাতে আমার প্রিয়া ভার্যাকে বধ করেছ। ধিক তোমাদের ধনুর্বিদ্যা, একটা বরাহ মারতে গিয়ে ঋষিপত্নীর প্রাণ হরণ করেছ!

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা কাতর হয়ে ঋষির চরণে নিপতিত হলেন। পাঞ্চালীও গলবস্ত্র হয়ে যুক্তকরে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, প্রভু, আমরা অজ্ঞাতসারে মহাপাপ করে ফেলেছি। আপনি যে দণ্ড দেবেন, যতই কঠোর হক তাই শিরোধার্য করব।

দ্রৌপদী এগিয়ে এসে বললেন, মহামুনি, আমার স্বামীদের শরাঘাতে আপনার প্রিয়া ভার্যার প্রাণবিয়োগ হয়েছে, তার দণ্ড-স্বরূপ আপনি আমার প্রাণ নিয়ে এঁদের মার্জনা করুন। মধ্যম

পাণ্ডব, তুমি চিতা রচনা কর, আমি অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব।

জবুলজ্জট আবার হুংকার করে বললেন, তুমি তো দেখছি অতি নির্বুদ্ধি রমণী! তোমার প্রাণ বিসর্জনে কি আমার পত্নী জীবিত হবে? আমি পত্নী চাই, এই দণ্ডেই চাই। পাণ্ডবরা আমাকে বিপত্নীক করেছে, আমি পাণ্ডবপত্নী পাঞ্চালীকে চাই। এই বলে জবুলজ্জট মুনি উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে ভূমিতে পদাঘাত করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির যুক্তকরে বললেন, প্রভু, প্রসন্ন হ'ন, পাঞ্চালী ভিন্ন যা চাইবেন তাই দেব।—

ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা॥

—আমাদের এই প্রিয়া ভার্যা প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী, মাতার ন্যায় পরিপালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাননীয়া। এঁকে আমরা কি করে ত্যাগ করব? আপনি বরং শাপানলে আমাকে ভস্মীভূত করে ফেলুন, পাঞ্চালীকে নিষ্কৃতি দিন।

জবুলজ্জট বললেন, অহো কি মূর্খ! তুমি পুড়ে মরলে পাঞ্চালী সহমৃতা হবে, অনর্থক নারীহত্যার নিমিত্তরূপে আমিও পাপগ্রস্ত হব। পাঞ্চালীকেই চাই।

ভীম করজোড়ে বললেন, তপোধন, আমি একটি নিবেদন করছি, শুনতে আজ্ঞা হক। আপনি জ্যেষ্ঠা পাণ্ডববধূ শ্রীমতী

হিড়িম্বাকে গ্রহণ করুন, পাঞ্চালীর পূর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল।

জবলজ্জট বললেন, তুমি অতি ধৃষ্ট দুষ্ট প্রতারক, একটা রাক্ষসীকে আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করতে চাও!

ভীম বললেন, প্রভু, হিড়িম্বা রাক্ষসী হলেও যখন মানবীর রূপ ধরেন তখন তাঁকে ভালই দেখায়। তাঁকে যদি যথেষ্ট মনে না করেন তবে আমাদের আরও আটজন অতিরিক্ত পত্নী আছেন, সব কটিকে নিয়ে পাঞ্চালীকে মুক্তি দিন। আমার ভ্রাতারা নিশ্চয় এতে সম্মত হবেন।

নকুল সহদেব সমস্বরে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

জবলজ্জট বললেন, তোমাদের অপর পত্নীরা এখানে নেই, অনুপস্থিত বস্তু দান করা যায় না। আমি এই মুহূর্তেই পত্নী চাই, পাঞ্চালীকেই চাই।

অর্জুন বললেন, প্রভু, ধর্মরাজ আর পাঞ্চালীকে নিষ্কৃতি দিন, আমাদের চার ভ্রাতাকে ভস্ম করে আপাতত আপনার ক্রোধ উপশান্ত করুন। এর পর অবসর মত একটি ঋষিকন্যার পাণি-গ্রহণ করবেন।

জবলজ্জট বললেন, তোমরা সকলেই মূর্খ, তথাপি তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি কিঞ্চিৎ প্রীত হয়েছি। তোমাদের ভস্ম করে আমার কোনও লাভ হবে না। আমি পত্নী চাই, যে আমার সেবা করবে। যদি নিতান্তই দ্রৌপদীকে ছাড়তে না চাও তবে

তাঁর নিষ্ক্রয়স্বরূপ তোমরা পঞ্চভ্রাতা আজীবন আমার দাসত্বে নিযুক্ত থাক।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহর্ষি, তাই হক, আমরা আজীবন দাস হয়ে আপনার সেবা করব।

ধৌম্য বললেন, মুনিবর, কাজটা কি ভাল হবে? তার চেয়ে বরং পঞ্চগব্যভক্ষণ চান্দ্রায়ণ ইত্যাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন। অর্থ তো এ'দের এখন নেই, ত্রয়োদশ বর্ষের অন্তে রাজ্যোদ্ধারের পর যত চাইবেন এ'রা দেবেন।

জবুলজ্জট প্রচণ্ড গর্জন করে বললেন, তুমি কে হে বিপ্র, আমাদের কথার উপর কথা কইতে এসেছ? ওরে কে আছিস, একটা দীর্ঘ রজ্জু নিয়ে আয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, প্রভু, রজ্জুর প্রয়োজন নেই, আমাদের উত্তরীয় দিয়েই বন্ধন করুন।

জবুলজ্জট যুধিষ্ঠিরাদি প্রত্যেকের কটিদেশে উত্তরীয়ের এক প্রান্ত বাঁধলেন এবং অপর প্রান্তের গুচ্ছ ধারণ করে পাণ্ডবাশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দ্রৌপদী আর্তনাদ করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। ধৌম্যাদি বিপ্রগণ স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে রইলেন।

চেতনালাভের পর দ্রৌপদী দেখলেন তিনি তাঁর কক্ষে সেবন্তীর ক্রোড়ে মস্তক রেখে শুয়ে আছেন, কৃষ্ণ তাঁকে তালবৃন্ত দিয়ে বীজন করছেন।

দ্রৌপদী বললেন, হা পঞ্চ আর্যপুত্র, কোথায় আছ তোমরা?

কৃষ্ণ বললেন, কৃষ্ণা, আশ্বস্ত হও। পঞ্চপাণ্ডব নিরাপদে আছেন, তাঁরা অশ্বত্থতরুতলে উপবিষ্ট হয়ে পাপনাশের জন্য অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করছেন। তুমি একটু সুস্থ হলেই তোমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাব।

—সেই ভয়ংকর ঋষি কোথায়?

—আর ভয় নেই। তিনি পঞ্চপাণ্ডবকে পশুর ন্যায় বন্ধন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, দৈবক্রমে পথে আমার সঙ্গে দেখা হল। আমি তাঁকে বললাম, তপোধন, করেছেন কি? এঁরা অকর্মণ্য বিলাসী ক্ষত্রিয়, আপনার কোনও কাজ করতে পারবেন না, অনর্থক অন্ন ধ্বংস করবেন। তিনি বললেন, তবে এদের চাই না, পাঞ্চালীকেই এনে দাও। আমি উত্তর দিলাম, পাঞ্চালী আরও অকর্মণ্যা, আরও বিলাসিনী, শুধু নিজের প্রসাধন করতে জানেন। আমি ফিরে গিয়ে আপনাকে একটি কর্মিষ্ঠা ব্রজনারী পাঠিয়ে দেব। আপাতত আপনি পাঞ্চালীর নিষ্ক্রয়-স্বরূপ এই সবৎসা ধেনু নিন, দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি খেয়ে বাঁচবেন। আমার মাতুল রাজর্ষি রোহিত এটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। জ্বলজ্জট মুনি তাতেই সম্মত হয়ে তোমার পতিদের মুক্তি দিলেন।

দ্রৌপদী বললেন, ধন্য সেই ধেনু যার মূল্য পাণ্ডবমহিষীর সমান। কিন্তু ঋষিপত্নীহত্যার পাপ থেকে পাণ্ডবগণ মুক্তি পাবেন কি করে?

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ঋষিপত্নীহত্যা হয় নি। অপ্সরা পঞ্চচূড়া ঠিক তাঁর পত্নী নন, সেবাদাসী বলা যেতে পারে। বরাহ তাঁকে ঈষৎ দন্তাঘাত করেছিল, তিনি ভয়ে চিৎকার করে আশ্রমে পালিয়ে গিয়ে মূর্ছিত হয়েছিলেন। জবলজ্জট তাঁকে দেখে ভেবেছিলেন বুঝি মরে গেছেন। পাণ্ডবদের মুক্তিলাভের পর আমি ঋষির সঙ্গে তাঁর আশ্রমে গিয়ে দেখলাম পঞ্চচূড়া দোলনায় দুলছেন।

দ্রৌপদী বললেন, কৃষ্ণ, এখনই আমাকে পতিগণের সকাশে নিয়ে চল। হা, আমি অপরাধিনী, এক মাস তাঁদের উপেক্ষা করেছি, এখন কোন্ বাক্যে ক্ষমাভিক্ষা করব?

—পাঞ্চালী, ক্ষমা চেয়ে অনর্থক তাঁদের বিব্রত ক'রো না, তাঁরা তো তোমার উপর অপ্রসন্ন হন নি। বহুদিন পরে তোমার সম্ভাষণ শোনবার জন্য তাঁরা তৃষিত চাতকের ন্যায় উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।

—গোবিন্দ, আমি তাঁদের কি বলব?

—পুরুষজাতি ভার্যার মুখে নিজের স্তুতি শুনলে যেমন পরিতৃপ্ত হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। কৃষ্ণা, তুমি পঞ্চ-পাণ্ডবের কাছে গিয়ে তাঁদের স্তুতি কর।

—হা কৃষ্ণ, আমি তাঁদের গঞ্জনাই দিয়েছি, এই দগ্ধ মুখে স্তুতি আসবে কেন? কি বলব তুমিই শিখিয়ে দাও।

—সখী কৃষ্ণা, বাগ্দেবী তোমার রসনায় অধিষ্ঠান করবেন, তুমি আজ সর্বসমক্ষে অসংকোচে তাঁদের সংবর্ধনা কর। এখন

আমার সঙ্গে পতিসন্দর্শনে চল। সেবন্তী, মাল্য প্রস্তুত হয়েছে?

সেবন্তী একটা ঝুড়ি দেখিয়ে বললে, এই যে। অন্য ফুল পাওয়া গেল না, শুধু কদম ফুলের মালা।

কৃষ্ণ বললেন, ওতেই হবে।

ধৌম্যাদি দ্বিজগণে বেষ্টিত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব অশ্বত্থ-তরুমূলে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মন্ত্রজপ সমাপ্ত হয়েছে। কৃষ্ণ সহিত দ্রৌপদীকে আসতে দেখে সকলে গাত্রোত্থান করলেন।

পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলি-পুটে পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, পাঞ্চালী, তোমার মৌন ভঙ্গ কর।

পাঞ্চালী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন।—দেবসম্ভব পঞ্চ আর্যপুত্র, পতিমহিমায় অভিভূত হয়ে আমি সম্ভাষণ করছি, যা মনে আসছে তাই বলছি, আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কর। পিতৃভবনে স্বয়ংবরসভায় ধনঞ্জয়কে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, ইনি লক্ষ্যভেদ করলে আনন্দে বিবশ হয়েছিলাম, এঁকেই পতি-রূপে পাব ভেবে নিজেকে শতধন্য জ্ঞান করেছিলাম। কিন্তু বিধাতা আর গুরুজনরা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখেন নি, পঞ্চভ্রাতার সঙ্গেই আমার বিবাহ দিলেন। অন্তর্যামী সাক্ষী, কিছুকাল পরেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হল, পঞ্চপতি

আমার অন্তরে একীভূত হয়ে গেলেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি যেমন পৃথক পৃথক এবং একযোগে অন্তঃকরণ রঞ্জিত করে সেইরূপ পঞ্চপতি স্বতন্ত্র ও মিলিত ভাবে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত করেছেন।

পাণ্ডবাগ্রজ, ইন্দ্রপ্রস্থে যখন পট্টমহিষী ছিলাম, তখন বসন-ভূষণে ও প্রসাধনে আমি প্রচুর অর্থব্যয় করেছি, প্রিয়জনকে মুক্ত-হস্তে দান করেছি। যখন যা চেয়েছি তুমি তখনই তা দিয়েছ, প্রশ্ন কর নি, অপব্যয়ের জন্য অনুযোগ কর নি। দাসদাসীদের আমি শাসন করেছি, তোমার প্রিয় পরিচারকগণ আমার কঠোরতার জন্য তোমার কাছে অভিযোগ করেছে, কিন্তু তুমি কর্ণপাত কর নি, পাছে পাণ্ডবমহিষীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তুমি শান্তিপ্রিয় ক্ষমাশীল ধর্মভীরু, তোমার ধর্মাধর্মের বিচারপদ্ধতি না বুঝে আমি বহু ভর্ৎসনা করেছি, তথাপি এই অপ্রিয়বাদিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ হও নি। অজাতশত্রু মহামনা ধর্মরাজ, তোমার মহত্ত্ব বোঝবার শক্তি ক জনের আছে?

মধ্যম পাণ্ডব, তুমি জরাসন্ধবিজয়ী মহাবল, দুঃসাধ্য কর্মই তোমার যোগ্য, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কর্মে তোমাকে নিযুক্ত করেছি, আমার প্রতি প্রীতিবশে তুমি যেন ধন্য হয়ে সে সকল সম্পাদন করেছ। তুমি ভোজনবিলাসী, রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী। ইন্দ্রপ্রস্থে বহুসংখ্যক নিপুণ সূপকার তোমার তৃপ্তিবিধান করত, কিন্তু এই অরণ্যাবাসে আমি যে সামান্য ভোজ্য এক পাকে রন্ধন করে তোমাকে দিয়ে থাকি তাতেই তুমি

তুষ্ট হও, কখনও অনুযোগ কর না যে বিস্বাদ বা অতিলবণ বা ঊনলবণ হয়েছে। নরশার্দূল, তোমাদের সকলের চেষ্টায় রাজ্যোদ্ধার হবে, কিন্তু আমার লাঞ্ছনার যোগ্য প্রতিশোধ একমাত্র তুমিই নিতে পারবে। দুর্যোধন আর দুঃশাসনকে তাদের অন্তিম দশায় মনে করিয়ে দিও যে পাণ্ডবমহিষীকে নির্যাতন করে কেউ নিস্তার পায় না।

তৃতীয় পাণ্ডব, তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ নও তথাপি তোমার ভ্রাতারা যুদ্ধকালে তোমারই নেতৃত্ব মেনে থাকেন। তুমি দেবপ্রিয় সর্বগুণাকর, অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, দেবসেনাপতি স্কন্দতুল্য রূপবান, নৃত্যগীতাদি কলায় পটু, হৃষীকেশ কৃষ্ণ তোমার অভিন্নহৃদয় সখা। যখন সুভদ্রাকে বিবাহ করে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপুরীতে এনেছিলে তখন আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সত্য বলছি, এখন আমার কোনও দুঃখ নেই। যে নারী পঞ্চপতির ভার্যা সে কোন্ অধিকারে সপত্নীকে ঈর্ষা করবে? সুভদ্রা আমার প্রিয়তমা ভগিনী, দ্বারকায় তার কাছে আমার পঞ্চপুত্রকে রেখে নিশ্চিন্ত আছি। পরন্তপ মহারথ, কুরুপাণ্ডবসমরে তুমিই পাণ্ডবসেনাপতি হবে, বাসুদেবের সহায়তায় বিপক্ষের সকল বীরকেই তুমি পরাস্ত করবে। কুরুপিতামহ ভীষ্ম আমার মহাগুরু, তোমাদের আচার্য দ্রোণ আমার নমস্য, কিন্তু দ্যূত-সভায় তাঁরা রাজকুলবধূকে রক্ষা করেন নি, বীরের কর্তব্য পালন করেন নি, কাপুরুষবৎ নিশ্চেষ্ট ছিলেন। সব্যসাচী, সম্মুখ সমরে মর্মভেদী শরাঘাতে তাঁদের সেই কর্তব্যচ্যুতি স্মরণ করিয়ে দিও।

চতুর্থ পাণ্ডব, তুমি সুকুমারদর্শন বিলাসপ্রিয়, কিন্তু যুদ্ধে দুর্ধর্ষ। ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি বিচিত্র পরিচ্ছদ এবং বহু রত্নালংকার ধারণ করতে, কিন্তু এখানে আমাকে অল্পভূষণা দেখে তুমিও নিরাভরণ হয়েছ, গন্ধমাল্যাদি বর্জন করেছ। তোমার সমবেদনায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে তুমি দশার্ণ ত্রিগর্ত পঞ্চনদ প্রভৃতি বহু দেশ জয় করেছিলে। আগামী সমরেও তুমি জয়লাভ করে যশস্বী হবে।

কনিষ্ঠ পাণ্ডব, তুমি আমার পতি ও দেবর, প্রেম ও স্নেহের পাত্র, বিশেষভাবে স্নেহেরই পাত্র। বনযাত্রাকালে আর্যা কুন্তী আমাকে বলেছিলেন, পাঞ্চালী, আমার পুত্র সহদেবকে দেখো, সে যেন বিপদে অবসন্ন না হয়। নির্ভীক অরিন্দম, তুমি অবসন্ন হও নি, যুদ্ধের জন্য অধীর হয়ে আছ। পূর্বে তুমি মাহিষ্মতী-রাজ দুর্মতি নীলকে এবং কালমুখ নামক নররাক্ষসগণকে পরাস্ত করেছিলে। দুরাত্মা কৌরবগণের সহিত যুদ্ধেও তুমি নিশ্চয় বিজয়ী হবে।

হে দেবপ্রতিম মহাপ্রাণ পঞ্চপতি, দেববন্দনাকালে দেবতার দোষকীর্তন কেউ করে না, তোমাদের দোষের কথাও এখন আমার মনে নেই। আজ আমার জন্য তোমরা জীবন দিতে উদ্যত হয়েছিলে, দাসত্ব বরণ করেছিলে। কোন্ নারী আমার তুল্য পতিপ্রিয়া? পতিনির্বাসিতা সীতা নয়, পতিপরিত্যক্তা দময়ন্তীও নয়। তোমরা অপর পত্নীদের পিত্রালয়ে রেখে কেবল আমাকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর যাপন করতে এসেছ, এক দুই

বা তিন অখণ্ড পত্নীর পরিবর্তে আমার পঞ্চমাংশেই তুষ্ট আছ। কোন্ স্ত্রী আমার ন্যায় গৌরবিণী? কোন্ পতি তোমাদের ন্যায় সংযমী? বহুবর্ষপূর্বে পিতৃগৃহে বিবাহমণ্ডপে একই দিনে তোমাদের কণ্ঠে একে একে মাল্য দিয়েছিলাম, আজ এই অরণ্যভূমিতে মুক্তাকাশতলে একই ক্ষণে পুনর্বার দিচ্ছি। মহানুভাব পঞ্চপতি, প্রসন্ন হও, স্নিগ্ধনয়নে আমাকে দেখ।

পাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবের কণ্ঠে মালা দিলেন, সেবন্তী শঙ্খ-ধ্বনি করলে, বিপ্রগণ সাধু সাধু বললেন, কৃষ্ণ আনন্দে করতালি দিলেন। তার পর দ্রৌপদীর মস্তকে করপল্লব রেখে যুধিষ্ঠির বললেন, পাঞ্চালী, তোমাকে অতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্নপ্রায় দেখছি, এখন স্বগৃহে বিশ্রাম করবে চল।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী প্রস্থান করলেন। কৃষ্ণকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে অর্জুন বললেন, মাধব, জ্বলজ্জট ঋষিটিকে পেলে কোথায়? তাঁর অভিনয় উত্তম হয়েছে, কিন্তু হাস্যদমনের জন্য তিনি বিকট মুখভঙ্গী করছিলেন। ভাগ্যক্রমে ধর্মরাজ পাঞ্চালী ও আর সকলে তা লক্ষ্য করেন নি।

ভীম বললেন, ওহে কৃষ্ণ, একবার এদিকে এস তো। পাঞ্চালী বোধ হয় আর কখনও আমাদের গঞ্জনা দেবেন না, কি বল?

কৃষ্ণ বললেন, মাঝে মাঝে দেবেন বই কি, ওঁর বাক্‌শক্তির তো কিছুমাত্র হানি হয় নি।

১৩৬০

নিকষিত হেম

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, প্লেটনিক লভ কি রকম জান? দুটি হৃদয়ের পরস্পর নিবিড় প্রীতি, তাতে স্থূল সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। চণ্ডীদাস যেমন বলেছেন—রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।

পিনাকীবাবু বয়সে বড় সেজন্য আড্ডার সকলেই তাঁকে খাতির করে। কিন্তু উপেন দত্ত তার্কিক লোক, পিনাকীর সবজান্তা ভাব সইতে পারে না। বললে, আচ্ছা সর্বজ্ঞ মশায়, দুই বন্ধুর মধ্যে যদি নিবিড় প্রীতি থাকে তবে তাকে প্লেটনিক বলবেন?

পিনাকীবাবু বললেন, তা কেন বলব, সম্পর্কটি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে হওয়া চাই।

—ও, তাই বলুন। এই যেমন নাতি আর ঠাকুমা, নাতনী আর ঠাকুর্দা, পিসী আর ভাইপো। এদের মধ্যে যদি গভীর ভালবাসা থাকে তাকে প্লেটনিক বলবেন তো?

—আঃ, তুমি কেবল বাজে তর্ক কর। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। মনে কর একটি পুরুষ আর একটি নারী আছে, তাদের মধ্যে বৈধ বা অবৈধ মিলন হতে বিশেষ কোনও বাধা নেই। তবু তারা কেবল হৃদয়ের প্রীতিতেই তুষ্ট। এই হল প্লেটনিক প্রেম।

—আচ্ছা। ধরুন ত্রিশ বছরের সুপুরুষ গুরু, আর বিশ বছরের সুশ্রী শিষ্যা। এমন ক্ষেত্রে মামুলী প্রেম আকছার হয়ে থাকে। কিন্তু মনে করুন গুরু খুব কদাকার, অথচ তার সুশ্রী স্ত্রী আছে। শিষ্যাও খুব কুৎসিত, তারও সুশ্রী স্বামী আছে। গুরু আর শিষ্যার মধ্যে মামুলী প্রেম হল না, কিন্তু ভক্তি আর স্নেহ খুব হল। একে প্লেটনিক বলবেন তো?

পিনাকী সর্বজ্ঞ রেগে গিয়ে বললেন, যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না। বিষয়টি তলিয়ে বোঝবার ইচ্ছে নেই, শুধু জেঠামি।

মাথা চুলকে উপেন দত্ত বললে, আজ্ঞে না, আমি শুধু একটা ভাল ডেফিনিশন খুঁজছি।

ললিত সাণ্ডেল বললে, ওহে উপেন, আমি খুব সোজা করে বলছি শোন। প্লেটনিক প্রেম মানে আলগোছে প্রেম, যেমন শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক। আচ্ছা যতীশ-দা, তুমি তো একজন মস্ত সাহিত্যিক, খুব পড়াশুনোও করেছ। তুমিই বুঝিয়ে দাও না প্লেটনিক প্রেম জিনিসটি কি?

যতীশ মিত্তির বললে, সব জিনিস কি বোঝানো যায়? যেমন ব্রহ্ম, তিনি তো বাক্য আর মনের অগোচর। ধর্ম, সৌন্দর্য, রস, আর্ট—এসবও স্পষ্ট করে বোঝানো যায় না। লাল রং, মিষ্টি স্বাদ, আঁষটে গন্ধ—এসবও অনির্বচনীয়, বুঝিয়ে বলা অসম্ভব, শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। প্রেমও সেই রকম।

উপেন বললে, বেশ তো, দৃষ্টান্ত দিয়েই প্লেটনিক প্রেম বুঝিয়ে দাও না।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, দৃষ্টান্ত তো পড়েই রয়েছে,—রামী-চণ্ডীদাস।

যতীশ বললে, সে কেবল চণ্ডীদাসের নিজের উক্তি, সম্পর্কটা বাস্তবিক কেমন ছিল তার কোনও সাক্ষী প্রমাণ নেই। আচ্ছা, আমি বিষয়টি একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি।—প্রেম বা লভ যাই বলা হক, তার অর্থ অতি ব্যাপক আর অস্পষ্ট। আমরা বলে থাকি—ঈশ্বরপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, দেশপ্রেম, পত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রেম। পণ্ডিতদের মতে বেগুন টমাটো আলু লংকা ধুতরো একই শ্রেণীতে পড়ে, এদের ফুল-ফলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিল আছে, যদিও গুণ আলাদা। তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম ভালবাসা স্নেহ সবই এক জাতের। তবে প্রেম বললে সাধারণত নরনারীর আদিম আসঙ্গপ্রবৃত্তিই বোঝায়। ভক্তি-শ্রদ্ধা যদি বেগুন-টমাটো হয়, স্নেহ যদি আলু হয়, তবে প্রেমকে বলা যেতে পারে লংকা। প্লেটনিক লভ বা রজকিনীপ্রেম তারই একটা রকম ফের, যেমন পাহাড়ী রাক্ষুসে লংকা, ঝাল নেই, শুধু লংকার একটু গন্ধ আছে।

ললিত বললে, বুঝেছি। একটু আঁষটে গন্ধ না থাকলে যেমন কাঙালী ভোজন বা বাঙালী ভোজন হয় না, তেমনি একটু কামগন্ধ না থাকলে মামুলী বা প্লেটনিক কোনও প্রেমই

হবার জো নেই। চণ্ডীদাসের নিকষিত হেম খাঁটী সোনা নয়, অন্তত এক আনা খাদ আছে।

যতীশ বললে, তোমার কথা হয়তো ঠিক, একটু লিপ্সা না থাকলে প্রেমের উৎপত্তি হয় না। এর বিচার মনোবিদ্‌গণ করবেন, আমার পক্ষে কিছু বলা অনধিকারচর্চা। আমি একটি অদ্ভুত ইতিহাস জানি। ঘটনাটি আরম্ভ হয় মামুলী প্রেম রূপে, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তা প্লেটনিক পরিণতি পায় এবং কিছুকাল থমথমে হয়ে থাকে। পরিশেষে ব্যাপারটা এমন বিশ্রী রকম জটিল হয়ে পড়ে যে প্লেটো বা চণ্ডীদাসের পক্ষেও তা অনির্বচনীয়। তবে ফ্রয়েড-শিষ্যদের অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা নিশ্চয় বিশ্লেষণ করে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

উপেন বললে, ব্যাখ্যা শুনতে চাই না, তুমি ইতিহাসটি বল যতীশ-দা।

যতীশ মিত্তির বলতে লাগল।—

অখিল শীলকে তোমাদের মনে আছে? বছর সাত-আট আগে দু-একবার আমার সঙ্গে এই আড্ডায় এসেছিল। সে আর আমি একসঙ্গে পড়তুম। আমি বি.এল. পাস করে উকিল হলুম, সে এম.এ. পাস করে কর্পোরেশনে একটা চাকরি যোগাড় করলে। কলেজে তার দু ক্লাস নীচে পড়ত নিরঞ্জনা তলাপাত্র। মেয়েটি সুন্দরী না হক, দেখতে মন্দ ছিল না,

টেনিস ভলিবল খেলায় নাম করেছিল, স্বাস্থ্যও খুব ভাল ছিল।

একদিন অখিল আমাকে বললে, সে নিরঞ্জনার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অখিলের বিধবা মা ব্রাহ্মণ পুত্রবধূ ঘরে আনতে রাজী নন। নিরঞ্জনার বাপ সর্বেশ্বর তলাপাত্রেরও ঘোর আপত্তি, তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে বেনে বরের বিবাহ হলে তাদের সন্তান হবে চণ্ডাল, শাস্ত্রে এই কথা আছে।

আমি অখিলকে বললুম, এক্ষেত্রে সনাতন উপায় যা আছে তাই অবলম্বন কর। নিরঞ্জনা কান্নাকাটি করুক, খাওয়া কমিয়ে দিক, যথাসম্ভব রোগা হয়ে যাক। তুমিও বাড়িতে মুখ হাঁড়ি করে থেকো, চুল রুক্ষ করে রেখো, নামমাত্র খেয়ো, বাকীটা রেস্তোরাঁয় পুষিয়ে নিও। ওরা দুজনে আমার প্রেসক্রিপশন মেনে নিলে, তাতে ফলও হল। অখিলের মা আর নিরঞ্জনার বাপ-মা অগত্যা রাজী হলেন। স্থির হল দু মাস পরে বিবাহ হবে।

নিরঞ্জনা কলকাতায় তার কাকার কাছে থেকে কলেজে পড়ত। তার বাপ সর্বেশ্বর তলাপাত্র বোম্বাই সরকারে বড় চাকরি করতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। আসন্ন বিবাহের স্বপ্নে অখিল দিন কতক বেশ মশগুল হয়ে রইল। তার পর একদিন সে আমাকে বললে, দেখ যতীশ, ক দিন থেকে নিরঞ্জনা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে আছে, কারণ জানতে চাইলে

কিছুই বলে না। অখিলকে আশ্বাস দেবার জন্যে আমি বললুম, ও কিছু নয়, বাপ-মাকে ছেড়ে যেতে হবে তার জন্যে বিয়ের আগে অনেক মেয়েরই একটু মন খারাপ হয়।

তার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা অখিল হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বললে, ভাই, সর্বনাশ হতে বসেছে। সর্বেশ্বরবাবু হঠাৎ কলকাতায় এসে নিরঞ্জনাকে বোম্বাইএ নিয়ে গেছেন। নিরঞ্জনার কাকার কাছে গিয়েছিলুম, তিনি গম্ভীর হয়ে আছেন, আমি প্রশ্ন করলে কিছু জানালেন না, ভাল করে কথাই বললেন না। আমি নিরঞ্জনাকে এইমাত্র টেলিগ্রাম করেছি, চিঠি লিখেও জানতে চেয়েছি—আমাকে কিছু না জানিয়ে তার হঠাৎ চলে যাবার মানে কি, আর কারও সঙ্গে তার বিয়ে হবে নাকি?

অখিলকে আমি বললুম, ব্যস্ত হয়ো না, দু দিন সবুর করে দেখ না নিরঞ্জনা কি উত্তর দেয়। চার-পাঁচ দিন পরে অখিল এসে বললে, এই দেখ নিরঞ্জনার চিঠি, তার মতলব তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিরঞ্জনা অখিলকে লিখেছে—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতেই পারে না, আমাকে একবারে ভুলে যাও। এর কারণ এখন বলতে পারব না, শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে অন্য কোনও পুরুষকে আমি বিয়ে করব না। তুমি আমাকে চিঠি লিখো না, বোম্বাইএ এসো না, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। যথাকালে সমস্তই জানতে পারবে।

অখিল পাগলের মতন হয়ে গেল। আমি তাকে শান্ত

করবার চেষ্টা করলুম, বললুম, ধৈর্য ধরে থাক, নিরঞ্জনা তো বলেছে যে সব কথা সে পরে জানাবে। কিন্তু অখিল ধৈর্য ধরবার লোক নয়, নিরঞ্জনাকে রোজ চিঠি লিখতে লাগল। চিঠির কোনও উত্তর এল না। অবশেষে সে বোম্বাইএ ছুটল। দশ দিন পরে ফিরে এসে আমাকে যা বললে তা এক অদ্ভুত ব্যাপার।

সর্বেশ্বর তলাপাত্র প্রথমটা অখিলকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন, নিরঞ্জনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতিও দেন নি। কিন্তু অখিলের কণ্ঠস্বর আর শোকোচ্ছ্বাস শুনতে পেয়ে নিরঞ্জনা দোতলা থেকে নেমে এসে বললে, বাবা, তুমি অন্য ঘরে যাও, যা বলবার আমিই অখিলকে বলব। বেচারাকে অনর্থক যন্ত্রণা দিয়ে লাভ কি, সব খোলসা করে বলাই ভাল।

এই কি নিরঞ্জনা? তাকে এখন চেনা শক্ত। মাথার চুল ছোট করে কেটেছে, পায়জামা আর পঞ্জাবি পরেছে, লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক বেড়ে গেছে। তার কণ্ঠস্বর মোটা হয়েছে, গোঁফ বেরিয়েছে, বুক একদম ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। অখিল অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল।

নিরঞ্জনা যে রহস্য প্রকাশ করলে তা এই।—সে পুরুষে রূপান্তরিত হচ্ছে। সন্দেহ অনেক দিন আগেই হয়েছিল, এখন সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ডাক্তার কির্লোস্কার তার চিকিৎসা করছেন, হরেক রকম গ্ল্যাণ্ড খাওয়াচ্ছেন আর

হরমোন ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, সম্পূর্ণ রূপান্তর হতে বড় জোর আরও ছ মাস লাগবে।

অখিল আকুল হয়ে বললে, না নিরঞ্জনা, তুমি পুরুষ হয়ো না, তা হলে আমি মরব। ট্রিটমেণ্ট বন্ধ করে দাও, বরং ডাক্তারকে বল তিনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে তোমার নারীত্ব রক্ষা পায়।

নিরঞ্জনা বললে, তা হবার জো নেই। আমি পুরুষ হয়েই জন্মেছি, এতদিন লক্ষণগুলো চাপা ছিল, এখন ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। যদি চিকিৎসা বন্ধ করি তা হলেও আমার পরিবর্তন হতে থাকবে, শুধু দু-তিন বছর দেরি হবে। তার চাইতে চটপট পুরুষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

অখিল কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার কি হবে নিরঞ্জনা? তুমি না হয় পুরুষই হয়ে গেলে, তোমার ডাক্তার কি আমাকে মেয়ে করে দিতে পারে না? তা হলেও তো আমাদের মিলন হতে পারবে।

নিরঞ্জনা বললে, পাগল হয়েছ? তুমি তো পুরোপুরি পুরুষ হয়েই জন্মেছ, তার আর নড়চড় হতে পারে না। এই বইখানা দিচ্ছি, ক্রাউলার্স সেক্স ফ্যাক্টর্স, পড়ে দেখো।

অখিল বললে, তুমি মেয়েই হও আর পুরুষই হও, তোমার সঙ্গে আমার হৃদয়ের যে সম্পর্ক তার পরিবর্তন হতে পারে না। আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না।

নিরঞ্জনা বললে, মন খারাপ ক'রো না। তুমি আর আমি

যাতে একসঙ্গে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করব। বাবা বলেছেন আমার চিকিৎসা শেষ হলেই আমাকে ইন্দোর ব্যাংকের সেক্রেটারির পোস্টে বসিয়ে দেবেন। বাবার খুব প্রতিপত্তি, আমি জেদ করলে তোমাকেও সেখানে একটা ভাল কাজ দিতে পারবেন। তত দিন তুমি বোম্বাইএ আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

অখিল তার কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বোম্বাইএ ফিরে গিয়ে নিরঞ্জনার কাছেই রইল। সর্বেশ্বরবাবু দয়ালু লোক, আপত্তি করলেন না। দ্রুপদ রাজার মেয়ে শিখণ্ডিনী যেমন পুরুষত্ব লাভ করে মহারথ শিখণ্ডী হয়েছিলেন, নিরঞ্জনাও তেমনি কয়েক মাস পরে পূর্ণপুরুষ মিস্টার নিরঞ্জন তলাপাত্র রূপে ইন্দোর ব্যাংকের সেক্রেটারি হল। সর্বেশ্বরবাবুর চেষ্টায় অখিল শীলও সেই ব্যাংকের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি হল। দুজনে একসঙ্গেই বাস করতে লাগল।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, সেরেফ গাঁজা। তুমি কি বলতে চাও এরই নাম নিকষিত হেম?

যতীশ মিত্তির বললে, আজ্ঞে না। স্টেনলেস স্টীল বলতে পারেন। সোনার জলুস নেই, লোহার মরচে নেই, ইস্পাতের ধারও নেই।

উপেন দত্ত বললে, তার পর কি হল?

—তার পর সব ওলটপালট হয়ে গেল। একদিন নিরঞ্জন

বললে, ওহে অখিল, এরকম একা একা ভাল লাগছে না, জগৎটা বোদা বোদা ঠেকছে। মা-বাবাও বিয়ের জন্যে তাড়া দিচ্ছেন। আমি বলি শোন।—শেঠ মুলুকচাঁদের একজোড়া যমজ মেয়ে আছে, দেখেছ তো? তাদের মা বাঙালী। খাসা মেয়ে দুটি। তুমি একটিকে আর আমি একটিকে বিয়ে করি এস। শেঠজীকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি রাজী, মেয়ে দুটিরও আপত্তি নেই।

বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু কিছুদিন পরেই দুই বোনের চুলোচুলি ঝগড়া বাধল, যেন তারা দুই সতিন। তার ফলে দুই বন্ধুরও মনোমালিন্য হল। অখিল অন্য চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেল, নিরঞ্জন ইন্দোরেই রইল। এখন আর দুজনের মুখদর্শন নেই।

উপেন দত্ত বললে, যাক, বাঁচা গেল।

১৩৬০

বালখিল্যগণের উৎপত্তি

পুরাণে আছে, বালখিল্য মুনিরা বুড়ো আঙুলের মতন লম্বা এবং সংখ্যায় ষাট হাজার। তাঁদের পিতার নাম ক্রতু, মাতার নাম ক্রিয়া। এই বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ, এতে কিছু ভুলও আছে। বালখিল্যগণের প্রকৃত ইতিহাস নিম্নে বিবৃত করছি।

পুরাকালে নৈমিষারণ্যে বহু ঋষির আশ্রম ছিল। ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র মহর্ষি ক্রতু তাঁর ভার্যা ক্রিয়ার সঙ্গে সেখানেই বাস করতেন। ক্রতু হলেন সপ্তর্ষিগণের ষষ্ঠ ঋষি। একদিন বিকাল বেলা কুটীরের দাওয়ায় বসে তিনি তাঁর পত্নীকে ব্যাকরণ শেখাচ্ছিলেন। ক্রতু বলছিলেন, প্রিয়ে, এই স্ত্রীপ্রত্যয়-প্রকরণ বড়ই কঠিন, তুমি উত্তমরূপে কণ্ঠস্থ কর। মৎস্য শব্দে য-ফলা আছে, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে মৎসী, য-ফলা হয় না। অনুরূপ মনুষ্য মনুষী। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, কিন্তু চন্দ্রের স্ত্রী চন্দ্রা। অশ্বের স্ত্রী অশ্বা, অথচ গর্দভের স্ত্রী গর্দভী।

সহসা একটা গম্ভীর চাপা আওয়াজ শোনা গেল। মহর্ষি ক্রতু সবিস্ময়ে কান পেতে শুনলেন যেন কেউ কলসীর ভিতর থেকে কথা বলছে—আপনি সব ভুল শেখাচ্ছেন।

ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রতু বললেন, কে রে তুই, এতদূর আস্পর্ধা যে আমার ভুল ধরিস!

আবার আওয়াজ হল—ওসব সেকেলে ব্যাকরণ চলবে না। স্ত্রীলিঙ্গ একই পদ্ধতিতে করতে হবে—মৎস্যী মনুষ্যী ইন্দ্রী চন্দ্রী অশ্বী গর্দভী, কিংবা মৎস্যানী মনুষ্যাণী ইন্দ্রণী চন্দ্রণী অশ্বিনী গর্দভিনী।

ক্রতু বললেন, কোথায় আছিস তুই, সম্মুখে আয়, লগুড়াঘাতে তোকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেব।

ঋষিপত্নী ক্রিয়া বললেন, স্বামী, অদৃশ্য মূর্খের বাক্যে কর্ণপাত ক'রো না। ব্যাকরণের পাঠ আজ স্থগিত থাকুক, সেদিন তুমি যে প্রত্যক্ষ দেবতাদের কথা বলছিলে তাই পুনর্বার শুনতে ইচ্ছা করি।

ক্রতু বললেন, প্রিয়ে, প্রণিধান কর। আকাশে তিন প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন—সূর্য চন্দ্র ও মেঘরূপ পর্জন্য। ভূতলেও তিন প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন—গর্ভধারিণী মাতা, জন্মদাতা পিতা, এবং বিদ্যাদাতা গুরু। এঁরাই সর্বাগ্রে উপাস্য। অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতির স্থান এঁদের নিম্নে।

পুনর্বার আওয়াজ হল—সব ভুল। আকাশে বা ভূতলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনও দেবতা নেই, চন্দ্র সূর্য পর্জন্য পিতা মাতা গুরু কেউ উপাস্য নয়।

অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ক্রতু বললেন, ওরে পাষণ্ড পিশাচ, সাহস থাকে তো দৃষ্টিগোচর হয়ে তর্ক কর্, নতুবা ব্রহ্মশাপে তোকে ধ্বংস করব।

ঋষিপত্নী ক্রিয়া কাতর হয়ে করজোড়ে বললেন, স্বামী, ও

পিশাচ নয়, আমার গর্ভস্থ পুত্রই কথা বলছে। অবোধ শিশুকে তুমি ক্ষমা কর।

—গর্ভস্থ পুত্র না জ্যেষ্ঠতাত! বেরিয়ে আয় হতভাগা অকালকুষ্মাণ্ড!

ক্রিয়া তাঁর পুত্রের উদ্দেশে বললেন, বৎস, ক্ষান্ত হও, পূজ্যপাদ পিতার বাক্যের প্রতিবাদ ক'রো না। আগে ভূমিষ্ঠ হও, তোমার দন্তোদ্গম হক, অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার চুকে যাক, তার পর যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে তবে পিতাকে সবিনয়ে শ্রদ্ধাসহকারে জিজ্ঞাসা ক'রো। এখন মৌনাবলম্বন কর, গর্ভস্থ অপোগণ্ডের পক্ষে বাচালতা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

মহর্ষি ক্রতুর অজাত অপত্য নীরব হল। অধ্যাপনার ব্যাঘাত হওয়ায় ক্রতু উঠে পড়ে সন্ধ্যাবন্দনা করতে গেলেন।

নৈমিষারণ্যের একদিকে গোমতী নদী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে সেখানে দেশ বিদেশ থেকে গর্ভিণী নারীরা সমাগত হন এবং সুপুত্রকামনায় পুণ্যতোয়া গোমতীতে স্নান করে ষণ্মাতৃকা অর্থাৎ ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করেন। এবারে এই শুভতিথিতে পুষ্যা নক্ষত্র ও বৃদ্ধিযোগ পড়েছে, সেজন্য অসংখ্য নারী গোমতীতীরে সমবেত হয়েছেন। ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া তাঁদের নেত্রীস্থানীয়া, তিনি সকলকে ব্রত-পালনের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

সহসা তাঁর গর্ভস্থ পুত্রের গুরুগম্ভীর স্বর শোনা গেল—ভো অজাত অপোগণ্ডগণ, শ্রূয়তাম্।

তণ্ডুলভাণ্ডবাসী মূষিকশাবকের ন্যায় কিচকিচকণ্ঠে সহস্র সহস্র ভ্রূণ উত্তর দিলে—হাঁ হাঁ আমরা শুনছি।

—বিশ্বের অপোগণ্ড এক হও।

—এক হব।

—সকলে আরাব উত্তোলন কর—প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনও দেবতা মানব না।

—মানব না।

—পিতা মাতা গুরু কারও শাসন মানব না।

—মানব না।

—গুরুকে আর ডরাব না, গুরুর গরু চরাব না। গুরু-কুলে নাহি রব, না পড়ে পণ্ডিত হব।

—না পড়ে পণ্ডিত হব।

—তবে কাকে মানবে, কার আজ্ঞায় চলবে?

—তাই তো, কাকে মানব?

—আদিবিদ্রোহী মহান্ ত্রিশঙ্কুকে, যিনি ঊর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে রাশিচক্রের বহির্দেশে বিদ্যমান রয়েছেন।

—মহান্ ত্রিশঙ্কু বিদ্যতাম্, অন্য গুরু ম্রিয়তাম্!

—ত্রিশঙ্কুর জন্য যিনি আকাশে নূতন স্বর্গলোক সৃষ্টি করেছেন সেই বশিষ্ঠশত্রু বিশ্বামিত্রকেও ধন্যবাদ দাও।

—বিশ্বামিত্র ধন্যবাদ, বশিষ্ঠাদি নিন্দাবাদ!

—ভ্রাতৃগণ, এই বারে গর্ভকারা থেকে বেরিয়ে এস, স্বাধীন হও, বসুন্ধরা ভোগ কর।

—কিন্তু এখন যে পাঁচ মাসও পূর্ণ হয় নি!

—তর্ক ক'রো না, ত্রিশঙ্কুর আজ্ঞা, ভূমিষ্ঠ হও।

—আমাদের পালন করবে কে, খেতে দেবে কে?

—তর্ক ক'রো না, তোমাদের স্নেহান্ধ মূর্খ পিতামাতাই পালন করবে। নিষ্ক্রান্ত হও।

ষাট হাজার গর্ভিণী আর্তনাদ করে উঠলেন, ষাট হাজার ভ্রূণ গর্ভচ্যুত হল। বহু প্রসূতি প্রাণত্যাগ করলেন।

আর্তনাদ শুনে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সত্বর গোমতী-তীরে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, সদ্যোজাত মুনিসন্তান-গণ গর্ভনাড়ী ছিন্ন করে ক্লেদাক্ত নগ্ন দেহে চিৎকার ও আস্ফালন করছে। সেই অকালপ্রসূত অকালপক্ক দন্তহীন জটাশ্মশ্রুধারী বালখিল্যগণের নেতা ক্রতুপুত্র ক্রাতব। সে দুই হাত নেড়ে বলছে, ভাই সব, এগিয়ে চল, আমরা এখানকার সমস্ত আশ্রম পুড়িয়ে ফেলব, তার পর বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে তার কামধেনু হরণ করে দুধ খাব। বিশ্বামিত্র যা পারেন নি আমরা তা পারব।

—দুধ খাব, দুধ খাব! মহান্ ত্রিশঙ্কু বিদ্যতাম্, বশিষ্ঠ ঋষি ম্রিয়তাম্! বালখিল্যা বর্ধন্তাম্, আর সবাই ক্ষীয়ন্তাম্!

বালখিল্যগণ উপদ্রব করতে উদ্যত হয়েছে দেখে ঋষিরা ভীত হয়ে বললেন, মহর্ষি ক্রতু, তোমার ওই অকালজাত পুত্র ক্রাতবই এই সর্বনাশের মূল, তুমিই এর প্রতিকার কর।

ক্রতু একটু চিন্তা করে বললেন, এরা ব্রাহ্মণসন্তান, অপজাত হলেও অধৃষ্য ও অবধ্য, নতুবা মুখে লবণ দিয়ে এদের ব্যাপাদিত করা যেত। এরা দেখছি ত্রিশঙ্কুর ভক্ত, সুতরাং ত্রিশঙ্কুর যাজক বিশ্বামিত্র হয়তো এদের বশে আনতে পারবেন। চল, বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হওয়া যাক।

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের প্রার্থনা শুনে বিশ্বামিত্র বললেন, এই বালখিল্যগণের উপর অপদেবতার ভর হয়েছে, এরা সদুপদেশ শুনবে না, কৌশলে এদের বশে আনতে হবে। চল, চেষ্টা করে দেখা যাক।

বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করে ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে ফিরে এলেন। বালখিল্যচমূ তখন ব্যূহবদ্ধ হয়ে আক্রমণের উপক্রম করছে।

বিশ্বামিত্র বললেন, ভো বালখিল্যগণ, আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি হচ্ছি আদিবিদ্রোহী ত্রিশঙ্কুর যাজক বিশ্বামিত্র।

বালখিল্যগণ চিৎকার করে বললে, মহামহিম বিশ্বামিত্রের জয়োঽস্তু, অন্য ঋষিদের ক্ষয়োঽস্তু!

বিশ্বামিত্র বললেন, কল্যাণমস্তু। বৎসগণ, তোমরা আমার অতি স্নেহের পাত্র। তোমাদের ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে, কিছু খাবে?

—খাব, খাব।

—মৃগমাংস? পুরোডাশ? পিষ্টক? সুপক্ব হরীতকী? ইক্ষুদণ্ড?

—ওসব চিবুতে পারব না, দাঁত নেই যে। আপনার সন্ধানে দুধ আছে?

—আছে। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ বা গবাদির দুগ্ধ তো তোমরা জীর্ণ করতে পারবে না। এস আমার সঙ্গে, আমি লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করব।

বালখিল্যদের নিয়ে বিশ্বামিত্র অলম্ব তীর্থে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি বিশাল বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় লক্ষ লক্ষ বাদুড় ত্রিশঙ্কুর মতন ঊর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে ঝুলছে। স্ত্রী-বাদুড়দের সম্বোধন করে বিশ্বামিত্র বললেন, অয়ি চর্মপর্ণা দন্তবতী পয়স্বিনী বিহঙ্গীর দল, এই সদ্যঃপ্রসূত বুভুক্ষু মুনিশাবকগণকে তোমরা স্তন্যদান কর।

বাদুড়-বনিতারা করুণাবিষ্ট হয়ে বললে, আহা, এস এস বাছারা।

বিশ্বামিত্র বালখিল্যদের একে একে তুলে বটবৃক্ষের শাখায় লম্বিত করে দিলেন। তারা বাদুড়ীদের বক্ষোলগ্ন হয়ে পরমানন্দে স্তন্যপানে রত হল।

ক্রতু প্রশ্ন করলেন, এরা কত কাল এইপ্রকার শান্ত হয়ে থাকবে?

বিশ্বামিত্র বললেন, এখন তো থাকুক, এর পর আবার যদি উপদ্রব করে তখন দেখা যাবে।

১৩৬০

সরলাক্ষ হোম

বরুণ বিশ্বাস একজন বড় অফিসার, যদিও বয়স ত্রিশের কম। ছেলেবেলায় মা বাপ মারা যাবার পর তার পিতৃবন্ধু গদাধর ঘোষ তাকে পালন করেন। তিনি খুব ধনী লোক, বিস্তর খরচ করে বরুণকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বরুণ ছেলেটিও ভাল, ছ মাস হল আমেরিকা থেকে গোটাকতক ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে। গদাধরের মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গে তার বিয়ে আগে থেকেই ঠিক করা আছে, তিন মাস পরে বিয়ে হবে।

গদাধর ঘোষ প্রতিপত্তিশালী লোক, মুরুব্বীর জোর খুব আছে। তাঁর চেষ্টায় বরুণ একটা বড় চাকরি পেয়ে গেছে—বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা, অর্থাৎ ডিরেক্টর অভ মংকি ডিপোর্টেশন। এই সরকারী বিভাগটির উদ্দেশ্য মহৎ। এদেশে মানুষ যা খায় বাঁদরও তাই খায়, তার ফলে মানুষের ভাগে কম পড়ে। সরকার স্থির করেছেন দেশের সমস্ত বাঁদর ক্রমে ক্রমে আমেরিকায় চালান দেবেন, সেখানে চিকিৎসা আর শারীর-বিদ্যার গবেষণার জন্য মুখপোড়া রূপী মর্কট প্রভৃতি সব রকম শাখামৃগের খুব চাহিদা আছে। বানরনির্বাসনের ফলে দেশের খাদ্যাভাব কমবে, আমেরিকান ডলারও ঘরে আসবে। কিন্তু শ্রেয়স্কর কর্মে বহু বিঘ্ন। যাঁরা জীবহিংসার বিরোধী তাঁরা

প্রবল আপত্তি তুললেন। বিদেশে গিয়ে বাঁদররা প্রাণ বিসর্জন দেবে এ হতেই পারে না। তারা শ্রীহনুমানের আত্মীয়, ভারতীয় রামরাজ্যের প্রজা, মানুষের মতন তাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে। ভারতবাসী যেমন গরুকে মাতৃবৎ দেখে তেমনি বাঁদরকে ভ্রাতৃবৎ দেখে। সরকার যদি নিতান্তই বানরনির্বাসন চান তবে এদেশেরই কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে তাদের জন্য উপনিবেশ নির্মাণ করুন, প্রচুর আম কাঁঠাল কলা ইত্যাদির গাছ পুঁতুন, ছোলা মটর বেগুন ফুটি কাঁকুড় ইত্যাদির খেত করুন, তদারকের ভাল ব্যবস্থা করুন। উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনে যে বেবন্দোবস্ত হয়েছে বাঁদরের বেলা তা হলে চলবে না। এই রকম আন্দোলনের ফলে বানরনির্বাসন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে, বরুণ বিশ্বাসের উপর হুকুম এসেছে এখন শুধু গনতি করে যাও, পরিসংখ্যান তৈরি কর। বরুণের অধীন বিশ জন পরিদর্শক আছে, তারা জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ায় আর রিপোর্ট পাঠায়—বাঁদর এত, বাঁদরী এত, বাঁদরছানা এত। কলকাতার অফিসে এইসব রিপোর্ট ফাইল করা হয় এবং মোটা মোটা খাতায় তার খতিয়ান ওঠে।

আজ বরুণের হাতে কাজ কিছু নেই, মনেও সুখ নেই। সে তার অফিসঘরে ঘূর্ণিচেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানছে আর আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় সামনের বাংলা কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি তার চোখে পড়ল—

যদি মনে করেন সময়টা ভাল যাচ্ছে না, মুশকিলে পড়েছেন, তবে আমার কাছে আসতে পারেন। যদি অবস্থা এমন হয় যে উকিল ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার পুলিস জ্যোতিষী বা গুরু-মহারাজ কিছুই করতে পারবেন না, তবে বৃথা দেরি না করে আমাকে জানান। এই ধরুন, আপনার সম্বন্ধী সপরিবারে আপনার বাড়িতে উঠেছেন, ছ মাস হয়ে গেল তবু চলে যাবার নামটি নেই। অথবা আপনার পিসেমশাই তাঁর মেয়ের বিয়ের গহনা কেনবার জন্য আপনাকে তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু রেস খেলতে গিয়ে আপনি তা উড়িয়ে দিয়েছেন। অথবা পাশের বাড়ির ভবানী ঘোষাল আপনাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে, কিন্তু সে হচ্ছে ষণ্ডামর্ক গুণ্ডা আর আপনি রোগা-পটকা। কিংবা ধরুন আপনার স্ত্রীর মাথায় ঢুকেছে যে তাঁর মতন সুন্দরী ভূভারতে নেই, তিনি সিনেমা অ্যাকট্রেস হবার জন্য খেপে উঠেছেন, আপনি কিছুতেই তাঁকে রুখতে পারছেন না। কিংবা মনে করুন আপনি একটি মেয়েকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেবার পর অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঘোরতর প্রেমে পড়েছেন, আগেরটিকে খারিজ করবার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। ইত্যাদি প্রকার সংকটে যদি পড়ে থাকেন তো সোজা আমার কাছে চলে আসুন। শ্রীসরলাক্ষ হোম, তিন নম্বর বেচু কর স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। সকাল আটটা থেকে দশটা, বিকেল চারটে থেকে রাত নটা।

কৃষ্ণকলি

বিজ্ঞাপনটি পড়ে বরুণ কিড়িং করে ঘণ্টা বাজালে। লাল চাপকান পরা একজন আরদালী ঘরে এল, বরুণ তাকে বললে, মিস দাস। একটু পরে ঘরে ঢুকল খঞ্জনা দাস, বরুণের অ্যাসিস্টাণ্ট, রোগা লম্বা, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা ঢেউ তোলা রুক্ষ ফাঁপানো চুল, চাঁচা ভুরু, গোলাপী গাল, লাল ঠোঁট, লাল নখ, নখের ডগা টিকে দেবার লানসেটের মতন সরু। সস্তা সিন্থেটিক ভায়োলেটের গন্ধে ঘর ভরে গেল।

বরুণ কাগজটা তার হাতে দিয়ে বললে, এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখ।

বিজ্ঞাপন পড়ে খঞ্জনা বললে, যাবে নাকি লোকটার কাছে? নিশ্চয় হামবগ জোচ্চোর, কিছুই করতে পারবে না, শুধু ঠকিয়ে পয়সা নেবে। আমার কথা শোন, দু নৌকোয় পা রেখো না, মাণ্ডবী আর তার বাপকে সোজা জানিয়ে দাও যে তুমি অন্য মেয়ে বিয়ে করবে।

—তার ফল কি হবে জান তো? আমার আড়াই হাজার টাকা মাইনের চাকরিটি যাবে। আমাদের চলবে কি করে? মাণ্ডবীর বাপ গদাধর ঘোষকে তুমি জান না, অত্যন্ত রাগী লোক।

—অত ভয় কিসের? তোমার সরকারী চাকরি, গদাই ঘোষ তোমার মনিব নয়, ইচ্ছে করলেই তোমাকে সরাতে পারে না। আর যদিই চাকরি যায়, অন্য জায়গায় একটা জুটিয়ে নিতে পারবে না?

বরুণ বললে, আজ বিকেলে এই সরলাক্ষ হোমের কাছে গিয়ে দেখি। যদি কোনও উপায় বাতলাতে না পারে তবে তুমি যা বলছ তাই করব।

এখন সরলাক্ষ হোমের পরিচয় জানা দরকার। লোকটির আসল নাম সরলচন্দ্র সোম। বি.এ. পাস করে সে স্থির করলে আর পড়বে না, চাকরিও করবে না, বুদ্ধি খাটিয়ে স্বাধীনভাবে রোজগার করবে। প্রথমে সে রাজজ্যোতিষীর ব্যবসা শুরু করলে। কিন্তু তাতে কিছু হল না, কারণ সামুদ্রিক আর ফলিত জ্যোতিষের বুলি তার তেমন রপ্ত নেই, মক্কেলরা তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হল না। তার পর সে সরলাক্ষ হোম নাম নিয়ে ডিটেকটিভ সেজে বসল, কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। সম্প্রতি সে একেবারে নতুন ধরনের ব্যবসা ফেঁদেছে, মক্কেলও অল্পস্বল্প আসছে।

সরলাক্ষ হোমের বাড়িতে ঢুকতেই যে ঘর সেখানে একটা ছোট টেবিল আর তিনটে চেয়ার আছে, মক্কেলরা সেখানে অপেক্ষা করে। তার পরের ঘরটি কনসল্টিং রুম, সেখানে সরলাক্ষ আর তার বন্ধু বটুক সেন গল্প করছে। বটুক সরলাক্ষর চাইতে বয়সে কিছু বড়, সম্প্রতি পাস করে ডাক্তার হয়েছে, কিন্তু এখনও কেউ তাকে ডাকে না। ঘরের ঘড়িতে পৌনে চারটে বেজেছে।

বটুক সেন বলছিল, খুব খরচ করে ব্যবসা তো ফাঁদলে।

ঘর সাজিয়েছ, দামী পর্দা টাঙিয়েছ, উর্দি পরা বয় রেখেছ, কাগজে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছ। মক্কেল কেমন আসছে?

সরলাক্ষ বললে, দুটি একটি করে আসছে। বেশীর ভাগই স্কুলের ছেলে, ষোল টাকা ফী দেবার সাধ্য নেই, টাকাটা সিকেটা যা দেয় তাই নিই। একজন প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সে অত্যন্ত বেঁটে বলে প্রণয়িনী তাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি অ্যাডভাইস দিয়েছি—সকালে দু পায়ে দুখানা ইট বেঁধে দু হাতে গাছের ডাল ধরে আধ ঘণ্টা দোল খাবে, বিকেলে মাঠে গিয়ে মনুমেণ্টের মাথার দিকে তাকিয়ে এক ঘণ্টা ধ্যান করবে, ছ মাসের মধ্যে ছ ইঞ্চি বেড়ে যাবে। আর একটি ছেলে কাশী থেকে পালিয়ে এখানে ফুর্তি করতে এসেছে, টাকা সব ফুরিয়ে গেছে, বাপকে জানাতে লজ্জা হচ্ছে। আমি বলেছি—লিখে দাও, ছেলেধরা ক্লোরোফর্ম করে নিয়ে এসেছে, মিস্টার সরলাক্ষ হোম আমাকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, পত্রপাঠ এক শ টাকা পাঠাবেন। আর এই দেখ বটুক-দা—শ্রীগদাধর ঘোষ চিঠি লিখেছেন, আজ সন্ধ্যা সাতটায় আসবেন।

বটুক বললে, বল কি হে! গদাধর তো মস্ত বড় লোক, তার আবার মুশকিল কি হল? তাকে যদি খুশী করতে পার তো তোমার বরাত ফিরে যাবে।

সরলাক্ষর প্রতিহাররক্ষী ছোকরা সোনালাল একটা স্লিপ নিয়ে এল। সরলাক্ষ পড়ে বললে, এ যে দেখছি একজন মহিলা, মাণ্ডবী ঘোষ। পাঠিয়ে দে এখানে।

কুড়ি-বাইশ বছরের একটি মেয়ে ঘরে এল। দুজন লোক দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে, মিস্টার হোমের সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথা বলতে চাই।

সরলাক্ষ বললে, আমিই হোম, ইনি আমার সহকর্মী ডাক্তার বটুক সেন। আপনি এঁর সামনে সব কথা বলতে পারেন, কোনও দ্বিধা করবেন না। বসুন আপনি।

মাণ্ডবী কিছুক্ষণ ঘাড় নীচু করে বসে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বললে, আমার বাবার নাম শুনে থাকবেন, শ্রীগদাধর ঘোষ।

সরলাক্ষ বললে, ও, তাঁরই কন্যা আপনি?

—হাঁ। বরুণ-দার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা অনেক কাল থেকে ঠিক করা আছে—বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা বরুণ বিশ্বাস।

—হাঁ হাঁ, এই নতুন পোস্টের কথা কাগজে পড়েছি বটে। খুব ভাল সম্বন্ধ, কংগ্রাট্স মিস ঘোষ।

মাণ্ডবী বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বললে, একটা বিশ্রী গুজব শুনছি, বরুণ-দা তার অ্যাসিস্টাণ্ট খঞ্জনা দাসের প্রেমে পড়েছে।

—আপনার বাবা জানেন?

—জানেন, কিন্তু তিনি তেমন গা করছেন না। বলছেন, ইয়ংম্যানদের অমন একটু আধটু বেচাল হয়ে থাকে, বিয়ে হলেই সেরে যাবে।

—কথাটা ঠিক, চটপট বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল।

—এক জ্যোতিষী বলেছেন আমার একটা ফাঁড়া আছে, তিন মাস পরে কেটে যাবে। তার পর বিয়ে হবে। কিন্তু তার মধ্যে বরুণ-দা কি করে বসবে কে জানে।

—দেখি আপনার হাত।

মাণ্ডবীর করতল দেখে সরলাক্ষ বললে, হুঁ, ফাঁড়া একটা আছে বটে, কিন্তু তিন মাস নয়, মাস খানিকের মধ্যেই আমি কাটিয়ে দেব। খঞ্জনা দাসের খপ্পর থেকে আপনি শ্রীবিশ্বাসকে উদ্ধার করতে চান তো?

—হাঁ। আপনি দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিন, ভীষণ ঝগড়া, যাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়। খরচ যা লাগে আমি দেব, এখন এই এক শ টাকা আগাম দিচ্ছি।

সরলাক্ষ সহাস্যে বললে, ব্যস্ত হবেন না, আমার প্রথম ফী ষোল টাকা মাত্র। কাজ উদ্ধার হলে আরও যা ইচ্ছে দেবেন।

বটুক বললে, মিস ঘোষ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সরলাক্ষর অসাধ্য কিছু নেই, ঠিক ঝগড়া বাধিয়ে দেবে।

মাণ্ডবী মাথা নেড়ে বললে, উঁহু, অত সহজ ভাববেন না। খঞ্জনাকে আপনারা চেনেন না, ভীষণ বদমাশ মেয়ে, দারুণ ছিনে জোঁক, সহজে ছাড়বে না। আর বরুণ-দাও ভীষণ বোকা।

সরলাক্ষ প্রশ্ন করলে, বরুণ-দাকে আপনি কত দিন থেকে জানেন?

—সেই ছেলেবেলা থেকে। আমার বাবাই ওকে মানুষ করেছেন, চাকরিও জুটিয়ে দিয়েছেন।

সোনালাল আবার ঘরে এসে একটা কার্ড দিলে। সরলাক্ষ দেখে বললে, আরে, স্বয়ং বরুণ বিশ্বাস দেখা করতে এসেছেন!

মাণ্ডবী চমকে উঠে বললে, সর্বনাশ, আমাকে তো দেখে ফেলবে! কি করি বলুন তো?

সরলাক্ষ বললে, কোনও চিন্তা নেই, আপনি ওই পিছনের ঘরে যান, মোটা পর্দা আছে, কিছু দেখা যাবে না। শ্রীবিশ্বাস চলে গেলে আপনি আবার এ ঘরে আসবেন।

মাণ্ডবী তাড়াতাড়ি পিছনের ঘরে গেল এবং পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পাততে লাগল।

বরুণ বিশ্বাস ঘরে ঢুকে বললে, মিস্টার হোমের সঙ্গে আমার কথা আছে, অত্যন্ত প্রাইভেট।

সরলাক্ষ বললে, আমিই সরলাক্ষ হোম, ইনি আমার কোলীগ ডাক্তার বটুক সেন। এঁর সামনে আপনি স্বচ্ছন্দে সব কথা বলতে পারেন।

বরুণ তবু ইতস্তত করছে দেখে বটুক বললে, মিস্টার বিশ্বাস, আপনি সংকোচ করবেন না। শার্লক হোম্‌সের জুড়িদার যেমন ডাক্তার ওআটসন, সরলাক্ষ হোমের তেমনি ডাক্তার বটুক সেন—এই আমি। তবে আমি ওআটসনের মতন হাঁদা নই। আপনিই বাঁদর দপ্তরের কর্তা তো?

বরুণ বললে, আমি হচ্ছি ডিরেক্টর অভ মংকি ডিপোর্টেশন।

সরলাক্ষবাবু, আমি একটি অত্যন্ত ডেলিকেট ব্যাপারের জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

সরলাক্ষ বললে, কিছু ভাববেন না, আপনি খোলসা করে সব কথা বলুন।

—শ্রীগদাধর ঘোষের নাম শুনেছেন তো? তাঁর মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গে আমার বিবাহ বহু কাল থেকে স্থির হয়ে আছে।

—চমৎকার সম্বন্ধ, কংগ্রাট্‌স মিস্টার বিশ্বাস।

—কিন্তু আমি অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি।

—বেশ তো, তাঁকেই বিবাহ করুন না।

—তাতে বিস্তর বাধা। শ্রীগদাধর আমার পিতৃবন্ধু, ছেলেবেলার অভিভাবক, এখনও মুরুব্বী। তিনিই আমার চাকরিটি করে দিয়েছেন, চটে গেলে তিনিই আমাকে তাড়াতে পারেন। অথচ তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি বিস্তর সম্পত্তি পাব, চাকরিও বজায় থাকবে।

—তবে তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করুন না।

—দেখুন, মাণ্ডবীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, তাকে ছোট বোন মনে করতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম হওয়া অসম্ভব।

—দেখতে বিশ্রী বুঝি?

—ঠিক বিশ্রী হয়তো নয়, কিন্তু আমার পছন্দর সঙ্গে একদম মেলে না। মোটাসোটা গড়ন, ডলিপুতুলের মতন টেবো

টেবো গাল। ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে বটে, কিন্তু চালচলন সেকেলে, স্মার্ট নয়, ভুল ইংরিজী বলে। এখনও জরির ফিতে দিয়ে খোঁপা বাঁধে, এক গাদা গহনা পরে জুজুবুড়ী সাজে।

—যাঁকে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি কেমন?

—খঞ্জনা? ওঃ, সুপর্ব, চমৎকার। মেমের মতন ইংরিজী বলে, তার সঙ্গে মাণ্ডবীর তুলনাই হয় না।

সরলাক্ষ বললে, দেখুন মিস্টার বরুণ বিশ্বাস, আপনার ইচ্ছেটা বুঝেছি। আপনি চাকরি বজায় রাখতে চান, গদাধর-বাবুর সম্পত্তিও চান, অথচ তাঁর কন্যাকে চান না। এই তো?

বরুণ মাথা নীচু করে বললে, সমস্যাটা সেইরকমই দাঁড়িয়েছে বটে। কোনও উপায় বলতে পারেন?

সরলাক্ষ বললে, একটা খুব সোজা উপায় বাতলাতে পারি। আপনি হিন্দু তো? এখনও বহু-বিবাহ-নিষেধের আইন পাস হয় নি। শ্রীগদাধরের কন্যাকে বিবাহ করে ফেলুন, যত পারেন সম্পত্তি আদায় করে নিন। ছ মাস পরে মিস খঞ্জনাকেও বিবাহ করবেন, তাঁকেই সুয়োরানীর পোস্ট দেবেন।

বরুণ বললে, আপনি গদাধর ঘোষকে জানেন না, ধড়িবাজ দুর্দান্ত লোক। সম্পত্তি যা দেবার তিনি মেয়েকেই দেবেন। খঞ্জনাকে বিয়ে করলে তৎক্ষণাৎ আমার চাকরিটি খাবেন আর মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন।

বটুক সেন বললে, আমি একটি ডাক্তারী উপায় বলছি শুনুন। মিস মাণ্ডবীকে বিয়ে করে ফেলুন। আপনাকে দু

পুরিয়া আর্সেনিক দেব, একটা শ্বশুরকে আর একটা শ্বশুর-কন্যাকে চায়ের সঙ্গে খাওয়াবেন। দুজনেই পঞ্চত্ব পেলে সম্পত্তি আপনার হাতে আসবে, চাকরিও থাকবে, তখন মিস খঞ্জনাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবেন।

—বিষ দিতে বলছেন?

—আর্সেনিকে আপত্তি থাকলে কলেরা জার্ম দিতে পারি, কাজ সমানই হবে।

বরুণ রেগে গিয়ে বললে, আপনাদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতে এখানে আসি নি, আমার সময়ের মূল্য আছে।

সরলাক্ষ বললে, না না রাগ করবেন না, আপনার প্রবলেমটি বড় শক্ত কিনা তাই বটুক-দা একটু ঠাট্টা করেছেন। আমি বলি শুনুন—আপনার আকাঙ্ক্ষাটি বড্ড বেশী নয় কি? কিছু কমিয়ে ফেলুন, দুধও খাবেন তামাকও খাবেন তা তো হয় না।

—আচ্ছা, সম্পত্তির আশা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি এমন উপায় বলতে পারেন যাতে মাণ্ডবীর সঙ্গে আমার বিয়ে ভেস্তে যায় অথচ চাকরির ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ গদাধর ঘোষ রাগ না করেন?

—আমাকে একটু সময় দিন, ভেবে চিন্তে উপায় বার করতে হবে। আপনি সাত দিন পরে আসবেন। ফী জানতে চান? আজ ষোল টাকা দিন, তার পর কাজ উদ্ধার হলে তার গুরুত্ব বুঝে আরও টাকা দেবেন।

বরুণ টাকা দিয়ে চলে গেল।

মাণ্ডবী পর্দা ঠেলে ঘরে এল। তার গা কাঁপছে, মুখ লাল, চোখ ফুলো ফুলো, দেখেই বোঝা যায় যে জোর করে কান্না চেপে রেখেছে।

বটুক সেন বললে, একি মিস ঘোষ, আপনি বড্ড আপসেট হয়ে পড়েছেন দেখছি! স্থির হয়ে বসুন, আমি দু মিনিটের মধ্যে একটা ওষুধ নিয়ে আসছি।

মাণ্ডবী বললে, ওষুধ চাই না, একটু জল।

সরলাক্ষ তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে দিলে। মাণ্ডবী চোখে মুখে জল দিয়ে ভাঙা গলায় বললে, সরলাক্ষবাবু, আর কিছু করবার দরকার নেই, বরুণ-দাকে আমি বিয়ে করব না।

সরলাক্ষ বললে, না না, ঝোঁকের মাথায় কোনও প্রতিজ্ঞা করবেন না। আপনার বাবা খুব খাঁটী কথা বলেছেন, বিয়ে হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—খঞ্জনার খপ্পর থেকে আপনার বরুণ-দাকে উদ্ধার করবই। যদি তিনি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চান তবে তাঁকে বিয়ে করবেন না কেন?

সজোরে মাথা নেড়ে মাণ্ডবী বললে, না না না। আমি মুটকী ধুমসী, আমি সেকেলে মুখ্খু জুজুবুড়ী, আর খঞ্জনা হচ্ছে বিদ্যাধরী—

—ও, আপনি বুঝি আড়ি পাতছিলেন! ভেরি ব্যাড। ওসব কথায় কান দেবেন না, বাঁদরের কর্তা হয়ে আপনার বরুণ-দা বাঁদুরে বুদ্ধি পেয়েছেন, খঞ্জনার মোহে পড়ে যা তা বলছেন।

মোহ কেটে গেলেই আপনার কদর তিনি বুঝবেন। আপনি হচ্ছেন সেই কালিদাস যা বলেছেন—পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, আপনি হচ্ছেন—শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা—

—চুপ করুন, অসভ্যতা করবেন না। এই নিন আপনার ষোল টাকা, আমি চললুম।

সরলাক্ষ হাতজোড় করে বললেন, মাণ্ডবী দেবী, মন শান্ত করুন, ধৈর্য ধরুন। যত শীঘ্র পারি খঞ্জনাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। দোহাই আপনার, তত দিন কিছু করে বসবেন না।

মাণ্ডবী নমস্কার করে চলে গেল। বটুক বললে, নাও, ঠেলা সামলাও এখন। সবাই দেখছি ভীষণ, খঞ্জনা ভীষণ বদমাশ, বরুণ-দা ভীষণ বোকা, আর মাণ্ডবী ভীষণ ছেলেমানুষ। পাত্রী এক দিকে যাচ্ছেন, পাত্র আর এক দিকে যাচ্ছেন, কার মন রাখবে? আবার পাত্রীর বাপ আসছেন, তিনি কি চান কে জানে।

সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীগদাধর ঘোষ প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে উপস্থিত হলেন। সরলাক্ষ খুব খাতির করে তাঁকে নিজের খাস কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালে এবং বটুকের পরিচয় দিলে।

পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটা বার করে শ্রীগদাধর একটু হেসে বললেন, খাসা ব্যবসা খুলেছেন সরলাক্ষবাবু। ডেলিকেট

ব্যাপারে মতলব দিতে পারে এমন একজন তুখড় চৌকশ লোকের বড়ই অভাব ছিল। আপনি বিজ্ঞাপনে ঠিকই লিখেছেন, ডাক্তার উকিল পুলিস জ্যোতিষী গুরু—এদের কি সব কথা বলা চলে, নাকি এরা সব সমস্যার সমাধান করতে পারে? আপনার তো বয়স বেশী নয়, ব্যবসাটি শিখলেন কোথায়? ডিগ্রী কিছু আছে?

সরলাক্ষ বললে, আমি হচ্ছি সাউথ আমেরিকার মায়া-আজটেক-ইংকা ইউনিভার্সিটির পিএচ. ডি, আমার রিসার্চের জন্য সেখানকার অনারারী ডিগ্রী পেয়েছি। বাগবাজার বিবুধ-সভাও আমাকে বুদ্ধিবারিধি উপাধি দিয়েছেন।

—বেশ বেশ। এখন আমার মুশকিলটা শুনুন।

শ্রীগদাধর তাঁর মুশকিলটা সবিস্তারে বিবৃত করে অবশেষে বললেন, আপনি ওই খঞ্জনা মাগীর কবল থেকে বরুণকে চটপট উদ্ধার করে দিন, আমার মেয়েটা বড়ই মনমরা হয়ে আছে।

সরলাক্ষ বললে, আপনার তো শুনেছি খুব প্রতিপত্তি, মন্ত্রীরা আপনার কথায় ওঠেন বসেন। আপনি মনে করলেই খঞ্জনাকে আণ্ডামানে বদলী করাতে পারেন।

—সেটি হবার জো নেই। খঞ্জনা হচ্ছে চতুর্ভুজ খাবলদারের তৃতীয় পক্ষের শালী। চতুর্ভুজকে চটানো আমার পলিসি নয়, আমার ছেলে দিল্লিতে তারই কম্পানিতে কাজ করে।

—বরুণকে দূরে বদলী করিয়ে দিন।

—সে কথা আমি যে ভাবি নি এমন নয়। কিন্তু বিচ্ছেদের ফলে প্রেম যে আরও চাগিয়ে উঠবে, চিঠিতে লম্বা লম্বা প্রেমালাপ চলবে, তার কি করবেন?

—তারও উপায় আছে। অন্য কারও সঙ্গে চটপট খঞ্জনার বিয়ে দিতে হবে।

—খেপেছেন! খঞ্জনা আমাদের ফরমাশ মত বিয়ে করবে কেন?

—জুতসই পাত্র পেলেই করবে। শুনুন সার—বরুণকে দূরে বদলী করান, তার জায়গায় এমন একজন বাহাল করুন যে খঞ্জনাকে বিয়ে করতে রাজী আছে।

—কোথায় পাব তেমন লোক?

বটুককে ঠেলা দিয়ে সরলাক্ষ বললে, কি বল বটুক-দা?

বটুক প্রশ্ন করলে, মাইনে কত?

শ্রীগদাধর বললেন, তা ভালই, আড়াই হাজার।

সরলাক্ষ বললে, রাজী আছ বটুক-দা? এমন চাকরি পেলে খঞ্জনাকে আত্মসাৎ করতে পারবে না?

—খুব পারব, খঞ্জনা গঞ্জনা ঝঞ্জনা কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

শ্রীগদাধর বললেন, বরুণকে ছেড়ে খঞ্জনা তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? চাকরির বদল যত সহজে হয় প্রেমের বদল তত সহজে হয় না।

বটুক বললে, সেজন্যে আপনি ভাববেন না সার, আমি খঞ্জনাকে ঠিক পটিয়ে নেব।

—কিন্তু জন্তুর সায়েন্স না জানলে তো বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা হতে পারবে না। তুমি তো নাড়ী-টেপা ডাক্তার?

সরলাক্ষ বললে, শুনুন সার। এমন বিদ্যে নেই যা ডাক্তাররা শেখে না, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বটানি জোঅলজি আরও কত কি। নয় বটুক-দা?

বটুক বললে, নিশ্চয়। জোঅলজি, বিশেষ করে মংকিলজি, আমার খুব ভাল রকম জানা আছে।

গদাধর একটু ভেবে বললেন, বেশ, কালই আমি মিনিস্টার ইন চার্জকে বলব। কিন্তু প্রথমটা টেম্পোরারি হবে, যদি দু মাসের মধ্যে খঞ্জনাকে বিয়ে করতে পার তবেই চাকরি পাকা হবে, নয়তো ডিসমিস।

বটুক বললে, দু মাস লাগবে না, এক মাসের মধ্যেই আমি তাকে বাগিয়ে নেব।

গদাধর বললেন, বেশ বেশ। বড় আনন্দ হল তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে। কাল আমাকে একবার দিল্লি যেতে হবে, গিন্নীকে ছেলের কাছে রেখে আসব, পাঁচ দিন পরে ফিরব। তার পরের রবিবারে বিকেলে চারটের সময় তোমরা আমার বাড়িতে চা খাবে, কেমন? আমার মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব।

সরলাক্ষ আর বটুক সবিনয়ে বললে, যে আজ্ঞে।

শ্রী গদাধরের সুপারিশের ফলে তিন দিনের মধ্যে বরুণের জায়গায় বটুক সেন বাহাল হল এবং বরুণ দহরমগঞ্জে বদলী হয়ে গেল। তার নতুন পদের নাম—কুক্কুটাণ্ড-বিবর্ধন-পরীক্ষা-সংস্থা-আয়ুক্তক, অর্থাৎ অফিসার ইন চার্জ হেন্‌স এগ এনলার্জমেণ্ট এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন।

নির্দিষ্ট দিনে সরলাক্ষ আর বটুক গদাধরবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। গদাধর বললেন, এই যে, এস এস। ওরে মাণ্ডবী, এদিকে আয়। এই ইনি হচ্ছেন শ্রীসরলাক্ষ হোম, মুশকিল আসান এক্সপার্ট। আর ইনি ডাক্তার বটুক সেন, আমাদের নতুন বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা। খাসা লোক এঁরা।

নমস্কার বিনিময়ের পর বটুক বললে, সার, একটি অপরাধ হয়ে গেছে, আপনাকে আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল, বড্ড তাড়াতাড়ি হল কিনা তাই পারি নি, মাপ করবেন। শ্রীমতী খঞ্জনার সংগে কাল আমার শুভ পরিণয় হয়ে গেছে।

বটুকের পিঠ চাপড়ে, শ্রীগদাধর বললেন, জিতা রহো, বাহবা বাহবা, বলিহারি, শাবাশ! আমরা ভারী খুশী হলুম শুনে, কি বলিস মাণ্ডবী? খেতে শুরু কর তোমরা, আমি চট করে গিন্নীকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে আসছি।

মাণ্ডবী বটুককে বললে, ধন্য রুচি আপনার, বাবার কাছে ঘুষ খেয়ে সেই শূর্পণখাটাকে বিয়ে করে ফেললেন! খঞ্জনাই

বা কি রকম মেয়ে, দু দিনের মধ্যে বরুণ-দাকে ভুলে গিয়ে আপনার গলায় মালা দিলে?

সরলাক্ষ বললে, তিনি অতি সুবুদ্ধি মহিলা, বরুণ-দার চাকরিটি মারেন নি, বটুক-দার চাকরি পাকা করে দিয়েছেন, আমারও মুখরক্ষা করেছেন।

মাণ্ডবী বললে, আপনার আবার কি করলেন?

—আপনাকে কথা দিয়েছিলুম দুজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাধিয়ে দেব, মনে নেই? আপনি শুনে খুশী হবেন, খঞ্জনা বউ-দি মিস্টার বরুণকে ভীষণ গালাগাল দিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন, আমিই সেটা ড্রাফ্‌ট করে দিয়েছি। এখন আপনার লাইন ক্লিয়ার। যদি বরুণ-দাকে আপনি একটি মোলায়েম চিঠি লেখেন তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ফীএর বাকী টাকাটা আপনাকে আর দিতে হবে না, আপনার বাবাই তা শোধ করবেন।

—উঃ, আপনাদের কি কোনও প্রিনসিপ্‌ল নেই, সেণ্টিমেণ্ট নেই, হৃদয় নেই, শোভন অশোভন জ্ঞান নেই? কি ভীষণ মানুষ আপনারা! মাপ করবেন, আপনাদের কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে যা তা বলে ফেলেছি।

গদাধরবাবু তার পাঠিয়ে ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ নানা রকম আলাপ চলল, তার পর সরলাক্ষ আর বটুক চলে গেল।

পরদিন বরুণের কাছ থেকে মাণ্ডবী একটা আট পাতা চিঠি পেলে।

এখানেই থামা যেতে পারে, কারণ এর পরে যা হল তা আপনারা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু এমন পাঠক অনেক আছেন যাঁরা নায়ক নায়িকার একটা হেস্তনেস্ত না দেখলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তাঁদের অবগতির জন্য বাকীটা বলতে হল।

সন্ধ্যার সময় শ্রীগদাধর সরলাক্ষর কাছে এলেন। সে একাই আছে, বটুক সস্ত্রীক সিনেমায় গেছে। গদাধর বললেন, ওহে সরলাক্ষ, এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল! মাণ্ডবীকে বরুণ মস্ত একটা চিঠি লিখেছে, বেশ ভাল চিঠি, খুব অনুতাপ জানিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চেয়েছে। আমিও অনেক বোঝালুম, কিন্তু মাণ্ডবী গোঁ ধরে বসে আছে,—বাঙালে গোঁ, তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, ছুঁচোকে আমি বিয়ে করতে পারব না। বাবা সরলাক্ষ, তুমি কালই তার সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে ব'লো। বরুণের মতন পাত্র লাখে একটা মেলে না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই, মাণ্ডবীকে রাজী করাতে যদি পার তো তোমাকে খুশী করে দেব।

সরলাক্ষ বললে, যে আজ্ঞে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সাধ্যমত চেষ্টা করব।

পরদিন শ্রীগদাধর সরলাক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল হে, রাজী করাতে পারলে?

—উঁহু, বরুণের ওপর ভীষণ চটে গেছেন, শুধু ছুঁচো

নয়, মীন মাইণ্ডেড মংকিও বলেছেন। আমার মতে চটপট তাঁর অন্যত্র বিবাহ হওয়া দরকার, নয়তো মনের শান্তি ফিরে পাবেন না। দারুণ একটা শক পেয়েছেন কিনা। তাঁর হৃদয়ে যে ভ্যাকুয়ম হয়েছে সেটা ভরতি করাতে হবে।

—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অন্য লোককে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন? ভাল পাত্রই বা পাই কোথা?

—যদি অভয় দেন তো নিবেদন করি। অনুমতি পেলে নিজের জন্যে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তুমি! তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? ধর মাণ্ডবী রাজী হল, কিন্তু আমার হোমরা চোমরা আত্মীয় স্বজনের কাছে জামাইএর পরিচয় কি দেব? মুশকিল আসান অধিকর্তা বললে তো চলবে না, লোকে হাসবে।

—আপনার কৃপা হলেই আমি একটা বড় পোস্ট পেয়ে যেতে পারি, আপনার জামাইএর উপযুক্ত।

—কোন্ কাজ পারবে তুমি?

—সরকার তো হরেক রকম পরিকল্পনা করছেন, মাটির তলায় রেল, শহরের চারদিক ঘিরে চক্রবেড়ে রেল, সমুদ্র থেকে মাছ, ড্রেনের ময়লা থেকে গ্যাস, আরও কত কি। আমিও ভাল ভাল স্কীম বাতলাতে পারি।

—বল না একটা।

—এই ধরুন উপকণ্ঠ-গির্যাশ্রম।

—সে আবার কি, গির্জে বানাতে চাও নাকি?

—আজ্ঞে না। গিরি-আশ্রম হল গির্যাশ্রম, উপকণ্ঠ-গির্যাশ্রম মানে সাবর্বান হিল স্টেশন। সহজেই হতে পারবে। কলকাতার কাছে লম্বা চওড়ায় এক শ মাইল একটা জমি চাই, তাতে প্রকাণ্ড একটা লেক কাটা হবে, তার মাটি স্তূপাকার করে লেকের মধ্যিখানে দশ-বারো হাজার ফুট উঁচু একটা পিরামিড বা কৃত্রিম পাহাড় তৈরি হবে। দার্জিলিং যাবার দরকার হবে না, পাহাড়ের গায়ে আর মাথায় একটি চমৎকার শহর গড়ে উঠবে, বিস্তর সেলামি দিয়ে লোকে জমি লীজ নেবে। আঙুর আপেল পীচ আখরোট বাদাম কমলালেবু ফলবে, নীচের লেকে অজস্র মাছ জন্মাবে। পাহাড়ের মাথা থেকে বিনা পয়সায় বরফ পাবেন, ঢালু গা দিয়ে আপনিই হড়াক করে নেমে আসবে—

—চমৎকার, চমৎকার, আর বলতে হবে না। কালই আমি মিনিস্টার ইন চার্জ অভ ল্যাণ্ড আপ্‌লিফ্‌টের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু তোমার পোস্টের নামটা কি হবে?

—পরিকল্পন-মহোপদেষ্টা, অর্থাৎ অ্যাডভাইজার-জেনারেল অভ স্কীম্‌স। সাড়ে তিন হাজার টাকা মাইনে দিলেই চলবে।

—নিশ্চিন্ত থাক বাবাজী, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি সব পাকা করে ফেলব। তুমি আর দেরি ক'রো না, লেগে যাও, এখন থেকেই মাণ্ডবীকে বাগাবার চেষ্টা কর।

মাণ্ডবী অতি লক্ষ্মী মেয়ে, আর সরলাক্ষর প্রেমের প্যাঁচ

অর্থাৎ টেকনিকও খুব উঁচুদরের। পাঁচ দিনের মধ্যেই সে মাণ্ডবীকে বাগিয়ে ফেললে।

কিন্তু বরুণ বিশ্বাসের কি হল? তার কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। তাকে বিয়ে করবার জন্যে একটা মাদ্রাজী, দুটো পঞ্জাবী আর তিনটে ফিরিঙ্গী মেয়ে ছেঁকে ধরেছে, তা ছাড়া ওখানকার জজ-গিন্নী ডেপুটি-গিন্নী আর উকিল-গিন্নীও নিজের নিজের আইবড় মেয়েদের বরুণের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন। বেচারা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

১৩৬০

আতার পায়েস

চুরির জন্যই যে চুরি তাতে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ পাওয়া যায়। দেশের কাজে চুরি, সরকারী কনট্রাক্টে চুরি, তহবিল তসরুফ, পকেট মারা, ইত্যাদির উদ্দেশ্য যতই মহৎ হক, তাতে আনন্দ নেই, শুধু স্থূল স্বার্থসিদ্ধি। গীতায় যাকে কাম্যকর্ম বলা হয়েছে, এসব চুরি তারই অন্তর্গত। কিন্তু যে চুরি অহেতুক, যা শুধু অকারণ পুলকে করা হয়, তা নিষ্কাম ও সাত্ত্বিক, অনাবিল আনন্দ তাতেই মেলে। যশোদাদুলাল শ্রীকৃষ্ণ ভালই খেতেন, কার্বোহাইড্রেট প্রোটীন ফ্যাট কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না, তথাপি তিনি ননি চুরি করতেন। তাঁর কটিতটের রঙিন ধটী যথেষ্ট ছিল, বস্ত্রাভাব কখনও হয় নি, তথাপি তিনি বস্ত্রহরণ করেছিলেন। এই হল নিষ্কাম সাত্ত্বিক চুরির ভগবৎপ্রদর্শিত নিদর্শন। রামগোপাল হাইস্কুলের মাষ্টার প্রবোধ ভটচাজ একবার এইরকম চুরিতে জড়িয়ে পড়েছিল।

প্রবোধ মাষ্টারের বয়স ত্রিশ, আমুদে লোক, ছাত্ররা তাকে খুব ভালবাসে। পুজোর বন্ধর দিন কতক আগে পাঁচটি ছেলে তার কাছে এল। তাদের মুখপাত্র সুধীর বললে, সার, মহা মুশকিলে পড়েছি।

প্রবোধ জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি?

—গেল বছর আমার বড়-দার বিয়ে হয়ে গেল জানেন তো? তার শ্বশুর ভৈরববাবু খুব বড়লোক, দেওঘরের কাছে গণেশ-মুণ্ডায় তাঁর একটি চমৎকার বাড়ি আছে। বউ-দি বলেছে, সে বাড়ি এখন খালি, পুজোর ছুটিতে আমরা জনকতক স্বচ্ছন্দে কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে আসতে পারি।

—এ তো ভাল খবর, মুশকিল কি হল?

—ভৈরববাবু বলেছেন, আমাদের সঙ্গে যদি একজন অভিভাবক যান তবেই আমাদের সেখানে থাকতে দেবেন।

—তোমার বড়-দা আর বউ-দিকে নিয়ে যাও না।

—তা হবার জো নেই, ওরা মাইসোর যাচ্ছে। আপনিই আমাদের সঙ্গে চলুন সার। ক্লাস টেনের আমি, ক্লাস নাইনের নিমাই নরেন সুরেন, আর ক্লাস এটের পিন্টু, আমরা এই পাঁচ জন যাব, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।

—সঙ্গে চাকর যাবে তো?

—কোনও দরকার নেই। সেখানে দরোয়ান আর মালী আছে, তারাই সব কাজ করে দেবে। খাবার জন্যে ভাববেন না সার। আমরা সঙ্গে স্টোভ নেব, কারি পাউডার নেব, চা চিনি গুঁড়ো দুধ আর বিস্কুটও দেদার নেব। ওখানে সস্তায় মুরগি পাওয়া যায়, বউ-দি কারি রান্না শিখিয়ে দিয়েছে। ওখানকার দরোয়ান পাঁড়েজী ভাত রুটি যা হয় বানিয়ে দেবে, আমরা নিজেরা দু বেলা ফাউল কারি রাঁধব। তাতেই হবে না?

প্রবোধ বললে, সব তো বুঝলুম, কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে

চাও কেন? মাষ্টার সঙ্গে থাকলে তোমাদের ফূর্তির ব্যাঘাত হবে না?

সজোরে মাথা নেড়ে সুধীর বললে, মোটেই একদম একটুও কিছু ব্যাঘাত হবে না, আপনি সে রকম মানুষই নন সার। আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের তিন ডবল ফূর্তি হবে।

নিমাই নরেন সুরেন সমস্বরে বললে, নিশ্চয় নিশ্চয়।

পিন্টু বললে, সার, কোনান ডয়েলের সেই লস্ট ওঅর্ল্ড গল্পটা ওখানে গিয়ে বলতে হবে কিন্তু।

প্রবোধ যেতে রাজী হল।

দেওঘর আর জসিডির মাঝামাঝি গণেশমুণ্ডা পল্লীটি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। বিস্তর সুদৃশ্য বাড়ি, পরিচ্ছন্ন রাস্তা, প্রাকৃতিক দৃশ্যও ভাল। ভৈরববাবুর অট্টালিকা ভৈরব কুটীর আর তার প্রকাণ্ড বাগান দেখে ছেলেরা আনন্দে উৎফুল্ল হল এবং ঘুরে ঘুরে চার দিক দেখতে লাগল। বাগানে অনেক রকম ফলের গাছ। গোটা কতক আতা গাছে বড় বড় ফল ধরেছে, অনেকগুলো একবারে তৈরী, পেড়ে খেলেই হয়।

প্রবোধ বললে, ভারী আশ্চর্য তো, ভৈরববাবুর দরোয়ান আর মালী দেখছি অতি সাধু পুরুষ।

সুধীর বললে, মনেও ভাববেন না তা, আমি এখানে এসেই সব খবর নিয়েছি সার। দরোয়ান মেহী পাঁড়ে আর মালী ছেদী

মাহাতো এদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া। দুজনে দুজনের ওপর কড়া নজর রাখে তাই এ পর্যন্ত কেউ চুরি করবার সুবিধে পায় নি।

প্রবোধ বললে, আত্মকলহের ফলই এই। পাঁড়ে আর মাহাতো যদি একমত হত তবে স্বচ্ছন্দে আতা বেচে দিয়ে লাভটা ভাগাভাগি করে নিতে পারত।

নিমাই বললে, আচ্ছা সার, আমাদের দেশনেতাদের মধ্যে তো ভীষণ ঝগড়া, তবুও চুরি হচ্ছে কেন?

সুধীর বললে, যা যাঃ, জেঠামি করিস নি। আগে বড় হ, তার পর পলিটিক্স বুঝবি।

নিমাই বললে, যদি দু-তিন সের দুধ যোগাড় করা যায় তবে চমৎকার আতার পায়েস হতে পারবে। আমি তৈরি করা দেখেছি, খুব সহজ।

সুধীর বললে, বেশ তো, তুই তৈরী করে দিস। ও পাঁড়েজী, তুমি কাল সকালে তিন সের খাঁটী দুধ আনতে পারবে?

পাঁড়ে বললে, জরুর পারব হুজুর।

নাওয়া খাওয়া আর বিশ্রাম চুকে গেল। বিকেল বেলা সকলে বেড়াতে বেরুল। ঘণ্টা খানিক বেড়াবার পর ফেরবার পথে সুধীর বললে, দেখুন সার, এই বাড়িটি কি সুন্দর, ভীমসেন ভিলা। গেটের ওপর কি চমৎকার থোকা থোকা হলদে ফুল ফুটেছে!

আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে পিন্টু চেঁচিয়ে উঠল—ওই ওই ওই একটা নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেল!

নিমাই বললে, এদিকে দেখুন সার, উঃ কি ভয়ানক পেয়ারা ফলেছে, কাশীর পেয়ারার চাইতে বড় বড়! নিশ্চয় এ বাড়িরও দরোয়ান আর মালীর মধ্যে ঝগড়া আছে তাই চুরি যায় নি।

ফটকে তালা নেই। সুধীর ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক উঁকি মেরে বললে, কাকেও তো কোথাও দেখছি না, কিন্তু ঘরের জানালা খোলা, মশারি টাঙানো রয়েছে। বোধ হয় সবাই বেড়াতে গেছে। দরোয়ান, ও দরোয়ানজী, ও মালী!

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সকলে ভিতরে এসে ফটকের পাল্লা ভেজিয়ে দিলে।

নিমাই বললে, একটা পেয়ারা পাড়ব সার?

প্রবোধ বললে, বাজারে প্রচুর পেয়ারা দেখেছি, নিশ্চয় খুব সস্তা, খেতে চাও তো কিনে খেয়ো। বিনা অনুমতিতে পরের দ্রব্য নিলে চুরি করা হয় তা জান না?

—জানি সার। চুরি করব না, শুধু একটা চেখে দেখব কাশীর পেয়ারার চাইতে ভাল কি মন্দ।

প্রবোধ পিছন ফিরে গম্ভীর ভাবে একটা তালগাছের মাথা নিরীক্ষণ করতে লাগল। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ ধরে নিয়ে নিমাই গাছে উঠল। একটা পেয়ারা পেড়ে কামড় দিয়ে বললে, বোম্বাই আমের চাইতে মিষ্টি!

সুধীর বললে, এই নিমে, সার্‌কে একটা দে।

নিমাই একটা বড় পেয়ারা নিয়ে হাত ঝুলিয়ে বললে, এইটে ধরুন সার, একটু চেখে দেখুন কি চমৎকার।

পেয়ারায় কামড় দিয়ে প্রবোধ বললে, সত্যিই খুব ভাল পেয়ারা। আর বেশী পেড়ো না, তা হলে ভারী অন্যায় হবে কিন্তু। লোভ সংবরণ করতে শেখ।

ততক্ষণ নিমাইএর সব পকেট বোঝাই হয়ে গেছে, তার সঙ্গীরাও প্রত্যেকে দু-তিনটে করে পেয়েছে। সুধীর বললে, এই নিমে, শুনতে পাচ্ছিস না বুঝি? সার রাগ করছেন, নেমে আয় চট করে, এক্ষুনি হয়তো কেউ এসে পড়বে।

হঠাৎ ক্যাঁচ করে গেটটা খুলে গেল, একজন মোটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর একটি রোগা বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করলেন। দুজনের হাতে গামছায় বাঁধা বড় বড় দুটি পোঁটলা। নিমাই গাছের ডাল ধরে ঝুলে ধুপ করে নেমে পড়ল।

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাঁ, এসব কি, দল বেঁধে আমার বাড়ি ডাকাতি করতে এসেছ! ভদ্রলোকের ছেলের এই কাজ? ঝব্বু সিং, এই ঝব্বু সিং—বেটা গেল কোথায়?

পোঁটলা দুটি নিয়ে মহিলা বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। ঝব্বু সিং এক লোটা বৈকালিক ভাং খেয়ে তার ঘরে ঘুমুচ্ছিল, এখন মনিবের চিৎকারে উঠে পড়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল। সে হুঁশিয়ার লোক, গেটে তাড়াতাড়ি তালা বন্ধ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে, হুজুর, হুকুম দেন তো থানে মে

খবর দিয়ে আসি। হো বৈজনাথজী, ছিয়া ছিয়া, ভদ্দর আদমীর ছেলিয়ার এহি কাম!

হুজুর বললেন, খুব হয়েছে, ডাকাতরা চোখের সামনে সব লুটে নিলে আর তুমি বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলে! তার পর, মশায়দের কোত্থেকে আগমন হল? এরা তো দেখছি ছোকরা, বজ্জাতি করবারই বয়েস; কিন্তু তুমি তো বাপু খোকা নও, তুমিই বুঝি দলের সর্দার?

প্রবোধ হাত জোড় করে বললে, মহা অপরাধ হয়ে গেছে সার। এই নিমাই, সব পেয়ারা দরওয়ানজীর জিম্মা করে দাও। আমরা বেশী খাই নি সার, মাত্র দু-তিনটে চেখে দেখেছি। অতি উৎকৃষ্ট পেয়ারা।

—কৃতার্থ হলুম শুনে। এরা বোধ হয় স্কুলের ছেলে। তোমার কি করা হয়? নাম কি?

—আজ্ঞে, আমার নাম প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য, মানিকতলার রামগোপাল হাই স্কুলের মাষ্টার। এরা সব আমার ছাত্র, পুজোর ছুটিতে আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে।

—খাসা অভিভাবকটি পেয়েছে, খুব নীতিশিক্ষা হচ্ছে! আমাকে চেন? ভীমচন্দ্র সেন, রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। রায়বাহাদুর খেতাবও আছে, কিন্তু এই স্বাধীন ভারতে সেটার আর কদর নেই। বিস্তর চোরকে আমি জেলে পাঠিয়েছি। তোমার স্কুলের সেক্রেটারিকে যদি লিখি—আপনাদের প্রবোধ

মাষ্টার এখানে এসে তার ছাত্রদের চুরিবিদ্যে শেখাচ্ছে, তা হলে কেমন হয়?

—যদি কর্তব্য মনে করেন তবে আপনি তাই লিখুন সার, আমি আমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করব। তবে একটা কথা নিবেদন করছি। কেউ অভাবে পড়ে চুরি করে, কেউ বিলাসিতার লোভে করে, কেউ বড়লোক হবার জন্যে করে। কিন্তু কেউ কেউ, বিশেষত যাদের বয়েস কম, নিছক ফূর্তির জন্যেই করে। আমি অবশ্য ছেলেমানুষ নই, কিন্তু এই ছেলেদের সঙ্গে মিশে, এই শরৎ ঋতুর প্রভাবে, আর আপনার এই সুন্দর বাগানটির শোভায় মুগ্ধ হয়ে আমারও একটু বালকত্ব এসে পড়েছে। এই যে পেয়ারা চুরি দেখেছেন এ ঠিক মামুলী কুকর্ম নয়, এ হচ্ছে শুধু নবীন প্রাণরসের একটু উচ্ছলতা।

—হুঁ। ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা। রবি ঠাকুর তোমাদের মাথা খেয়েছেন। বিয়ে করেছ?

—করেছি সার।

—তবে পুজোর ছুটিতে বউকে ফেলে এখানে এসেছ কি করতে? বনে না বুঝি?

—আজ্ঞে, খুবই বনে। কিন্তু তিনি তাঁর বড়লোক দিদি আর জামাইবাবুর সঙ্গে শিলং গেলেন, আমি এই ছেলেদের আবদার ঠেলতে পারলুম না তাই এখানে এসেছি! সার, যে কুকর্ম করে ফেলেছি তার বিচার একটু উদার ভাবে করুন।

আপনি ধীর স্থির প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তি, ছেলেমানুষী ফুর্তির বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন—

—কে বললে ঊর্ধ্বে উঠে গেছি? আমাকে জরদ্‌গব গিধড় ঠাউরেছ নাকি?

—তা হলে আশা করতে পারি কি যে আমাদের ক্ষমা করলেন? আমরা যেতে পারি কি?

—পেয়ারাগুলো নিয়ে যাও, চোরাই মাল আমি স্পর্শ করি না। আচ্ছা, এখন যেতে পার, এবারকার মতন মাপ করা গেল।

এমন সময় মহিলাটি বাইরে এসে বললেন, কি বেআক্কেলে মানুষ তুমি, এরা তোমার এজলাসের আসামী নাকি? তুমি এদের মাপ করবার কে? তোমাকে মাপ করবে কে শুনি? এখন যেয়ো না বাবারা, এই বারান্দায় এসে একটু ব'স।

ভীমবাবু বললেন, এদের খাওয়াবে নাকি? তোমার ভাঁড়ার তো ঢুঢু, চা পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে, হরি সরকার বাজার থেকে ফিরলে তবে হাঁড়ি চড়বে।

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, যা আছে তাই দেব। মিনিট দশ সবুর করতে হবে বাবারা।

গৃহিণী ভিতরে গেলে ভীমবাবু বললেন, উনি ভীষণ চটে গেছেন, না খাইয়ে ছাড়বেন না, অগত্যা ততক্ষণ এই এজলাসেই তোমরা আটক থাক। এখানে উঠেছ কোথায়?

প্রবোধ বললে, ভৈরব কুটীরে, স্টেশনের দিকে যে রাস্তা গেছে তারই ওপর।

ভীমবাবু বললেন, কি সর্বনাশ! যার ফটকের পাশে বেগনী বুগনভিলিয়ার ঝাড় আছে সেই বাড়ি?

—আজ্ঞে হাঁ। বাড়িটার কোনও দোষ আছে?

—নাঃ, দোষ তেমন কিছু নেই। তোমরা ওখানে উঠেছ তা ভাবি নি।

নিমাই বললে, ভূতে পাওয়া বাড়ি নাকি?

—ভূত কোন্ বাড়িতে নেই? এ বাড়িতেও আছে। ও পাড়াটায় বড্ড চোরের উপদ্রব, এ পাড়ার চাইতে বেশী।

একটু পরে ভীমবাবুর পত্নী একটা বড় ট্রেতে বসিয়ে একটি ধূমায়মান গামলা এবং গোটাকতক বাটি আর চামচ নিয়ে এলেন। ভীমবাবু একটা টেবিল এগিয়ে দিয়ে বললেন, এ কি এনেছ, আতার পায়েস যে! এর মধ্যেই তৈরি করে ফেললে?

গৃহিণী বললেন, আর তো কিছু নেই, এই দিয়েই ছেলেরা একটু মিষ্টিমুখ করুক।

ভীমবাবু বললেন, সবটাই এনেছ নাকি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি আর লোভ ক'রো না বাপু। ছেলেরা যে পেয়ারা পেড়েছে তাই না হয় একটা খেয়ো। চিবুতে না পার তো সেদ্ধ করে দেব।

সুধীর সহাস্যে বললে, সার, আমাদের ওখানে বিস্তর আতা ফলেছে, ইয়া বড় বড়। কাল সকালে পায়েস বানিয়ে আপনাদের দিয়ে যাব।

ভীমবাবু বললেন, না না, অমন কাজটি ক'রো না। আতা আমার সয় না।

ভৈরব কুটীরে ফিরে এসে নিমাই বললে, একি, গাছের বড় বড় আতাগুলো গেল কোথায়?

সুধীর বললে, বোধ হয় পাঁড়েজী সদ্দারি করে পেড়ে রেখেছে। ও পাঁড়ে, আতা কি হল?

পাঁড়ে ব্যস্ত হয়ে এসে মাথায় একটু চাপড়-মেরে করুণ কণ্ঠে বললে, কি কহবো হুজুর, বহুত ঝমেলা হয়ে গেছে। এক মোটা-সা বুঢ়া বাবু আর এক দুবলা-সা বুঢ়ী মাঈ এসেছিল। বাবু পটপট সব আতা ছিঁড়ে লিলে। আমি মানা করলে খাফা হয়ে বললে, চোপ রহো উল্লু। আমার ডর লাগল, শায়দ কোই বড়া অপসর উপসরকা বাবা উবা হোবে—

সুধীর বললে, হাতে লাল গামছা ছিল?

—জী হাঁ, উসি মে তো বাঁধ কে লিয়ে গেল।

হাসির প্রকোপ একটু কমলে নিমাই বললে, হলধর দত্তর 'চোরে চোরে' গল্পর চাইতে মজার!

প্রবোধ বললে, যাক, আমরা ঠকি নি, আতার পায়েস খেয়েছি, পেয়ারাও পেয়েছি। কিন্তু ভীমচন্দ্র সেন মশায়ের জন্য দুঃখ হচ্ছে, তাঁর গিন্নী তাঁকে বঞ্চিত করেছেন।

নিমাই বললে, ভাববেন না সার, দিন দুই পরেই আবার বিস্তর আতা পাকবে, তখন পায়েস করে ভীমসেন মশায় আর তাঁর গিন্নীকে খাওয়াব।

১৩৬০

ভবতোষ ঠাকুর

ভবতোষ সরকারের বয়স তিপ্পান্ন। উলুবেড়ের সবডেপুটি ছিলেন, তিন বছর হল চাকরি ছেড়েছেন। এখন কেবল পড়েন আর ভাবেন। নিঃসন্তান, স্ত্রী আছেন। কলকাতার ভাড়া বাড়িতে বাস করেন, পেনশন যা পান তাতে কোনও রকমে সংসার চলে।

সকাল আটটা। দোতলায় সিঁড়ির পাশে একটি ছোট ঘরে তক্তাপোশে ছেঁড়া শতরঞ্জির উপর বসে ভবতোষ চোখ বুজে কি একটা ভাবছেন। তাঁর দুই ভক্ত জিতেন আর বিধু মেঝেতে মাদুরের উপর বসে আছে।

জিতেন বললে, প্রভু, শুনছেন?

ভবতোষের সাড়া নেই।

জিতেন। প্রভু, ও প্রভু, দয়া করে একবারটি শুনুন।

এবারে ভবতোষের হুঁশ হল। বললেন, আঃ, কেন খামকা প্রভু প্রভু করছ? আমি সামান্য মানুষ, কারও প্রভু নই। ফের যদি প্রভু বল তো সাড়া দেব না।

জিতেন। বুঝেছি। আচ্ছা ঠাকুর—

ভবতোষ। দেবতা আর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলে।

আবার রসুয়ে বামুন আর পশ্চিম অঞ্চলে নাপিতকেও ঠাকুর বলে। আমি কায়স্থসন্তান, ঠাকুর হতে পারি না।

হাত জোড় করে জিতেন বললে, প্রভু, কায়স্থরা তো ক্ষত্রিয়, জনক আর শ্রীকৃষ্ণের সজাতি। তাঁদের মতন আপনিও তত্ত্বকথা বলে থাকেন, আপনার ব্রাহ্মণ ভক্তও অনেক আছে। দয়া করে যদি পইতেটি নিয়ে ফেলেন আর মাথায় একটি শিখা রাখেন তবে আর সংকোচের কারণ থাকবে না।

ভবতোষ। দেখ জিতেন, হাজার বছর আগে হয়তো আমার পূর্বপুরুষরা পইতে ধারণ করতেন, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণদের আজ্ঞায় তাঁরা ত্যাগ করেছিলেন। আমার ঠাকুরদার কাছে তাঁর ঠাকুরদার বর্ণনা শুনেছি—পরনে খাটো ধুতি, গায়ে মেরজাই, কাঁধে কোঁচানো চাদর, পায়ে নাগরা, মাথায় টিকি, কপালে ফোঁটা, আর মুখে ফারসী বুলি। আমার ঠাকুরদা অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, মুরগি খেতে শিখে টিকি ফোঁটা আর ফারসী তিনটেই ত্যাগ করেন।

জিতেন। পাদরীদের পাল্লায় পড়েছিলেন বুঝি?

ভবতোষ। কারও পাল্লায় পড়বার লোক তিনি ছিলেন না।

বিধু বললে, ওহে জিতেন, ইনি পইতে আর টিকি নাই বা ধারণ করলেন, পুরুত ঠাকুর সাজলে এঁর মহত্ত্ব কিছুমাত্র বাড়বে না। আমি বলি কি, ইনি দাড়ি রাখুন, চুল বাড়তে দিন, গেরুয়া কাপড় পরুন, আর গোটা কতক মোটা মোটা

রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিন। সাধু মহাত্মার এই হল লক্ষণ।

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

বিধু। আচ্ছা, দাড়ি জটা রুদ্রাক্ষ না হয় বাদ দিলেন। গোঁফটা কামিয়ে ফেলুন, গেরুয়া সিল্কের ধুতি পঞ্জাবি পরুন, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বাঁধুন, কিংবা কানঢাকা টুপি পরুন। তত্ত্বদর্শী স্বামী মহারাজদের বেশ ধারণ করুন।

ভবতোষ। আমি সাধু মহাত্মা নই, তত্ত্বদর্শীও নই। আমার সাজ যা আছে তাই থাকবে।

জিতেন। এইবারে বুঝেছি। মুক্তপুরুষদের পইতে টিকি জটা গেরুয়া রুদ্রাক্ষ কিছুই দরকার হয় না। কিন্তু আপনাকে তো নাম ধরে ডাকা চলবে না। সবাই আপনাকে ঠাকুর বলে, আমরাও তাই বলব। দোহাই, এতে আপত্তি করবেন না। বলছিলুম কি—আপনি তো জীবন্মুক্ত পুরুষ, গৃহে বাস করলেও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, আপনার মুখের একটু কথা শোনবার জন্যে জজ ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রোফেসার মেয়ে-পুরুষ সবাই লালায়িত। সবাই জানতে চায়—ইনি কি ব্রহ্ম-জ্ঞানী পণ্ডিত, না যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ? পরমহংস, না শুধুই পরম ভক্ত? ভগবানের অংশাবতার, না ষোল আনা ভগবান? কি বলব ঠাকুর?

ভবতোষ। বলবে, ইনি একজন রিটায়ার্ড সবডেপুটি।

এই সময় ভবতোষের বাল্যবন্ধু নিখিল বাঁড়ুজ্যে এলেন। বললেন, কি হে ভবতোষ, কি রকম চলছে? বিস্তর ভক্ত জুটিয়েছ শুনছি, সুবিধে কিছু করতে পারলে?

ভবতোষ। নাঃ। যদি কোথাও একটা নিরিবিলি গুহা পাই তো পালিয়ে গিয়ে সেখানে ঢুকব।

নিখিল। পালাবে কেন। রামকৃষ্ণদেব তো ভক্তপরিবৃত হয়ে সুখে বাস করতেন।

ভবতোষ। তিনি পরমহংস ছিলেন, তাঁর মতন ধৈর্য কোথায় পাব। তবে তিনিও মাঝে মাঝে উত্ত্যক্ত হয়ে শালা বলে ফেলতেন।

জিতেন। নির্জন আশ্রমের অভাব কি ঠাকুর? আপনি একবারটি হাঁ বলুন, আপনার ভক্তরা বরানগরে বা কাশীতে বা রাঁচিতে চমৎকার আশ্রম বানিয়ে দেবে।

নিখিল। রাজী হয়ে যাও হে, তিন জায়গাতেই আশ্রম করাও। দু-চারটে গেস্ট রুম রেখো, আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকব। এমন সুবিধে ছেড়ো না ভবতোষ।

জিতেন। দেখুন নিখিলবাবু, আপনি ঠাকুরকে নাম ধরে ডাকবেন না, তুমিও বলবেন না, তাতে আমরা বড় ব্যথা পাই।

নিখিল। বেশ বেশ, আমিও এখন থেকে ঠাকুর আর আপনি বলব। কিন্তু যখন আর কেউ থাকবে না তখন নাম ধরেই ডাকব। কি বলেন ঠাকুর?

ভবতোষ। হাঁ হাঁ।

ভবতোষ ঠাকুর

প্রাতঃকালীন ভক্তসমাগম কি রকম হয়েছে দেখবার জন্য জিতেন আর বিধু নীচে নেমে গেল।

নিখিল বললেন, আচ্ছা ভবতোষ, তুমি তো বলতে যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ, লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকচরিত্রের উন্নতি সাধনই শ্রেষ্ঠ কর্ম। তবে এখন নির্জনে থাকতে চাচ্ছ কেন? শুধু নিজের মুক্তির জন্যে লুকিয়ে তপস্যা, আর নিজের পেট ভরাবার জন্যে লুকিয়ে খাওয়া, দুটোই তো স্বার্থপরতা।

ভবতোষ। আমি অক্ষম দুর্বল, বক্তৃতা দিতে পারি না, ধর্মপ্রচার করতে পারি না, কীর্তন গাওয়া আসে না, লোক-শিক্ষার পদ্ধতিও জানি না। বুদ্ধ যিশু শংকর চৈতন্য রাম-মোহন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গান্ধী—এঁদের শক্তির কণামাত্র আমার নেই, তাই শুধু আত্মচিন্তা করি। কেউ যদি আমার কাছে কিছু জানতে চায় তো যথাবুদ্ধি বলি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সত্য কথা শুনতে কেউ চায় না, সবাই স্বার্থসিদ্ধির সোজা উপায় বা অলৌকিক শক্তি খোঁজে।

জিতেন ফিরে এসে বললে, ঠাকুর, আজ বেশী লোক আসে নি, সবাই ভোট দিতে গেছে কি না। চার পাঁচ জন লোক নীচে দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

নিখিল। কি রকম লোক জিতেনবাবু?

জিতেন। সেই গীতায় যেমন চতুর্বিধা ভজন্তে মাং আছে—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, আর জ্ঞানী।

ভবতোষ। জ্ঞানীদের চলে যেতে বল, তাদের যখন জ্ঞান

আছেই তবে আবার এখানে কেন। অর্থার্থীদেরও বলে দাও আমার অর্থ দেবার সামর্থ্য নেই। আর যারা এসেছে একে একে পাঠিয়ে দাও।

জিতেন বেরিয়ে গেলে নিখিল প্রশ্ন করলেন, একে একে পাঠাতে বললে কেন? ও তো বিলিতী কায়দায় ইণ্টারভিউ। ভক্তের দল মহাপুরুষকে সর্বদা ঘিরে থাকবে এই তো চিরকেলে দস্তুর।

ভবতোষ। যারা দেখা করতে আসে তাদের সকলের মতিগতি তো সমান নয়, যে যেমন তাকে সেই রকম উত্তর দিতে হয়। বুদ্ধিভেদ করতে গীতায় নিষেধ আছে।

প্রথমে এলেন মাধব ধর। ইনি একজন জিজ্ঞাসু। ধর মশায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন, ঠাকুর, আপনার কৃপায় আমার অভাব কিছু নেই, ব্যবসা ভালই চলছে, বাড়ির সবাই ভালই আছে। শুধু একটা সমস্যা সমাধানের জন্যে আপনার কাছে এসেছি।

ভবতোষ। আপনার অভাব কিছু নেই শুনে বড় আনন্দ হল ধর মশায়, আপনি ভাগ্যবান লোক। আপনার সমস্যাটি কি তা বলুন।

মাধব। হেঁ হেঁ, আমাকে মশায় বলবেন না, আমি আপনার দাসানুদাস। সমস্যাটা হচ্ছে—ঠিকুজিতে আমার পরমাই লেখা আছে পঁচানব্বই বছর, এখন সবে ষাট চলছে। কিন্তু সেদিন

তারাদাস জ্যোতিষী হাত দেখে বললেন, পঁচাত্তরেই মৃত্যুযোগ। ধরুন যদি পঁচাত্তরেই মারা যাই তবে বাকী বিশ বছরের কি হবে? কোষ্ঠী আর কররেখা কোনওটা তো মিথ্যে হতে পারে না।

ভবতোষ। ওহে নিখিল, তুমি তো একজন বড় অ্যাকাউণ্টাণ্ট, ধর মশায়ের প্রশ্নটির জবাব তুমিই দাও।

নিখিল। নিশ্চিন্ত থাকুন ধর মশায়, বাকী বিশ বছর পরজন্মে ক্যারেড ফরোআর্ড হবে। প্রিভিলেজ লীভ আর পরমায়ু পচে যায় না।

ধর মশায় ভাবতে ভাবতে প্রস্থান করলেন। শ্রীপতি রায় ঘরে এলেন।

ভবতোষ। আসুন শ্রীপতিবাবু। আজ আবার কি মনে করে? আমি নিতান্ত অকিঞ্চন তা তো সেদিন বলেই দিয়েছি। আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করবেন না।

শ্রীপতি। হেঁ হেঁ, আমাকে শ্রীপতিবাবু বলবেন না, শুধু শ্রীপতি বা ছিরু। বয়সে আপনার চাইতে কিছু বড় হলেও আমি আপনার দাসানুদাস। বড় দুর্ভাবনায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

ভবতোষ। বলে ফেলুন।

শ্রীপতি। আপনার আশীর্বাদে আমার সাত ছেলে, তিন মেয়ে, তা ছাড়া গিন্নী আছেন। আমার বয়স পঁয়ষট্টি হল, ব্লাড প্রেশার ডায়াবিটিস বাত সবই আছে, কোন্ দিন মরব

কিছুই ঠিক নেই। গিন্নীর বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, সাত ছেলের একটাও মানুষ হল না, তিনটে মেয়ে প্রেম করতে গিয়ে তিন ব্যাটা ওআর্থলেস বর জুটিয়েছে। তাই এমন ব্যবস্থা করে দিতে চাই যাতে আমার অবর্তমানে এদের কোনও অভাব না থাকে।

ভবতোষ। আপনার ভাবনা কি, শুনতে পাই আপনি কোটিপতি। অ্যাটর্নিকে বলুন, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।

শ্রীপতি। কি জানেন, সাত ছেলের প্রত্যেককে দশ লাখ দিতে চাই, তিন মেয়ে আর গিন্নীকে সাত সাত লাখ। তার কমে এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে চলতেই পারে না। তা ছাড়া মানত করেছি আপনার জন্যে একটি ভাল আশ্রম আর দেব-মন্দির বানিয়ে দেব, তাতেও লাখ দুই লাগবে। একুনে দরকার এক ক্রোর, কিন্তু আমার পুঁজি মোটে পঁচাশি লাখ। আরও পনরো লাখ না হলে চলবে না তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

ভবতোষ। আপনি বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হয়েও বিশ্বাস করেন আমি আপনাকে পনরো লাখ পাইয়ে দিতে পারি?

শ্রীপতি। বিশ্বাস করি বই কি ঠাকুর। আমার ব্যবসা-বুদ্ধিতে যা হয় না আপনার দৈব শক্তিতে তা নিশ্চয় হবে।

ভবতোষ পিছন ফিরে চোখ বুজে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। শ্রীপতি বললেন, কি মুশকিল, ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন দেখছি। আমার আবার তাড়া আছে, দলবল নিয়ে পোলিং স্টেশনে যেতে হবে। আচ্ছা নিখিলবাবু, আপনি তো ঠাকুরের অন্তরঙ্গ,

শ্রীগৌরাঙ্গের যেমন নিত্যানন্দ। আপনিই দয়া করে আমার জন্যে ঠাকুরকে একটু ধরুন না।

নিখিল। দেখুন মশায়, কেউ যখন বড় ডাক্তারকে কনসল্ট করতে আসে তখন প্রথমেই জানায় আগে কি রকম চিকিৎসা হয়েছিল, কোন্ কোন্ ডাক্তার দেখেছিল, কি কি ওষুধ খেয়েছিল। আগে আপনার কেস হিস্টরি অর্থাৎ পূর্বের ক্রিয়াকলাপ খোলসা করে জানাতে হবে। কালোবাজার, পারমিট, কনট্রাক্ট, চাল চিনি কাপড় সরবরাহ, ভেজাল ঘি তেল ওষুধের ব্যবসা—এসব চেষ্টা করে দেখেছেন কি?

শ্রীপতি। সবই দেখেছি দাদা, কিন্তু তেমন সুবিধে করতে পারি নি। হাজার হক আমি বাঙালীর সন্তান, ধর্মজ্ঞান আছে, কালচার আছে, টুপি-পাগড়িধারীদের মতন বেপরোয়া ব্যবসা-বুদ্ধি নেই।

নিখিল। ফটকা বাজার, লটারি, রেস—এসব চেষ্টা করে দেখেছেন?

শ্রীপতি। ওসবেও কিছু হয় নি। তিনজন রাজজ্যোতিষীর কাছে টিপ্‌স নিয়েছি, শনিমন্দিরে পুজো দিয়েছি, বগলামুখী কবচ আর ধূমাবতী মাদুলি ধারণ করেছি, রক্তমুখী নীলার আংটিও পরেছি। কিছুই হল না, শুধু বিস্তর টাকা গচ্চা গেল। সব ব্যাটা ঠক জোচ্চোর।

নিখিল। তাই তো রায় মশায়, কিছুই বাকী রাখেন নি দেখছি। আচ্ছা, সোনা করবার চেষ্টা করেছেন?

শ্রীপতি রায় সোৎসাহে বললেন, এইবার কাজের কথা বলেছেন নিখিলবাবু। ঠাকুর জানেন নাকি সোনা করতে?

নিখিল। ঠাকুর সবই জানেন, কিন্তু কিছু করবেন না। পরমহংসদেবের মতন ইনিও বলেন—টাকা মাটি, মাটি টাকা। সোনা তৈরি হল বিজ্ঞানীর কাজ, পরমাণু চুরমার করে আবার গড়তে হয়। আপনি ডক্টর বাঞ্ছারাম মহাপাত্রকে ধরুন। তিনি আমেরিকা থেকে সোনা তৈরি শিখে এসেছেন, কিন্তু ল্যাবরেটরির অভাবে কিছু করতে পারছেন না। আপনি লাখ পাঁচ-ছয় খরচ করে ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিন, তিনি আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

শ্রীপতি। তিনি কিছু সোনা করে নিলেই তো তাঁর টাকার যোগাড় হয়।

নিখিল। আপনি যে উলটো কথা বলছেন মশায়। আগে গরু তার পর দুধ, আগে ল্যাবরেটরি তবে তো সোনা।

শ্রীপতি রেগে গিয়ে বললেন, ও-সব ধাপ্পাবাজিতে ভোলবার লোক আমি নই। আপনাদের সেরেফ বুজরুকি।

নিখিল। ঠিক ধরেছেন শ্রীপতিবাবু। আচ্ছা, এখন আসুন, নমস্কার।

জিতেন আর বিধুর সঙ্গে অজয় ঘোষাল আর তার স্ত্রী সুভদ্রা এল, দুজনেরই বয়স কম। এরা পাশের বাড়িতে থাকে। ভবতোষের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে সুভদ্রা বললে,

আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনুন বাবা, তাকে হারিয়ে আমি কি করে বাঁচব?

বিধু চুপিচুপি ভবতোষকে বললে, এ'দের একমাত্র ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগে কাল মারা গেছে।

ভবতোষ বললেন, স্থির হয়ে ব'স মা, আমার পা ছাড়। চোখে মুখে একটু জল দাও,—বিধু শিগ্‌গির একটু জল আন। আগে একটু শান্ত হও, নইলে আমার কথা বুঝতে পারবে কেন।

সুভদ্রা। আমার তিন বছরের খোকা, পদ্মফুলের মতন ছেলে, কোথায় গেল বাবা?

ভবতোষ। মা, তোমার নিষ্পাপ খোকা ভগবানের কোলে সুখে আছে। স্বর্গে গিয়ে কিংবা পরজন্মে তুমি তাকে ফিরে পাবে।

সুভদ্রা। ভগবান কেন তাকে নিলেন? তার খেলনা যে চারদিকে ছড়ানো রয়েছে, তার হাসি কান্না আবদার কি করে ভুলব বাবা, এই শোক কি করে সইব?

ভবতোষ। মহা মহা দুঃখও ক্রমশ সয়ে যায়, তুমিও সইতে পারবে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন—একথা বিশ্বাস কর তো?

সুভদ্রা। না বাবা, করি না। এই সর্বনাশ করে ভগবান আমার কি মঙ্গল করলেন? এত সব বুড়ো বুড়ী রয়েছে, তাদের ছেড়ে আমার খোকাকে নিলেন কেন?

ভবতোষ। ভগবান কেন কি করেন তা বোঝা তো আমাদের সাধ্য নয়। পূর্বজন্মের কর্মফলে লোকে ইহজন্মে সুখ দুঃখ ভোগ করে—একথা বিশ্বাস কর তো?

সুভদ্রা। পূর্বজন্মের কথা জানি না বাবা। কার পাপের ফলে আমার খোকা অকালে গেল? তার নিজের পাপ, না তার বাপের, না আমার? দয়াময় ভগবান আমাদের পাপ করতে দিয়েছিলেন কেন? ঢের বড় বড় পাপীকে তো তিনি সুখে রেখেছেন।

ভবতোষ। মা, এখন তুমি বড় ব্যাকুল হয়ে আছ, পাপ পুণ্য কর্মফল এসব কথা এখন থাক, আগে তুমি একটু স্থির হও। তোমার মনে ভক্তি আছে?

সুভদ্রা। ভক্তি তো ছিল বাবা, এখন যে হতাশ হয়ে গেছি। যিনি আমার ছেলেকে কেড়ে নিলেন তাঁকে কি করে ভক্তি করব?

ভবতোষ। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, এখন শুধু মন শান্ত কর। যত পার জপ কর, স্তব পাঠ কর।

সুভদ্রা। কি জপ করব, কি স্তব করব, বলে দিন বাবা।

ভবতোষ। যা তোমার ভাল লাগে—হরিনাম, শিবনাম, দুর্গানাম, সত্যং শিবসুন্দরম্। এই স্তবমালা বইখানি নিয়ে যাও, যে স্তব তোমার পছন্দ হয় আবৃত্তি ক'রো। ভগবানকে ব'লো—'দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা, দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।'

সুভদ্রা। আবার কবে আসব বাবা?

ভবতোষ। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।

সুভদ্রার ছোট ভাই বাইরে অপেক্ষা করছিল, সে তার দিদিকে নিয়ে চলে গেল।

সুভদ্রার স্বামী অজয় বললে, আমার ব্যবস্থা কি করবেন ঠাকুর?

ভবতোষ। তোমার স্ত্রী আর তোমার একই ব্যবস্থা। তুমি পুরুষ মানুষ, সহজেই শোক দমন করতে পারবে, স্ত্রীকেও সান্ত্বনা দেবে। ওঁকে নিয়ে দিনকতক তীর্থভ্রমণ করে এস।

অজয়। ঠাকুর, এত শোকের মধ্যেও আপনার কাছে স্বীকার করছি—আমি বড় অবিশ্বাসী, দয়াময় ভগবানে আমার আস্থা নেই। সুভদ্রাকে যা বললেন, তাতে আমি শান্তি পাব না।

নিখিল। আপনাদের কথার মধ্যে আমি কথা বলছি, অপরাধ নেবেন না ঠাকুর। এই অজয়কে আমি খুব জানি, এর অহেতুকী ভক্তি হবে এমন মনে হয় না। কর্মফল, জন্মান্তর, পরলোকে পুনর্মিলন, মঙ্গলময় ঈশ্বর—ইত্যাদি মামুলী প্রবোধবাক্যে অজয় সান্ত্বনা পাবে না। তোতা পাখির মতন স্তবপাঠেও এর কিছু হবে না।

ভবতোষ। দু-চার দিন যাক, এরা দুজনে একটু শান্ত হক, তারপর আমি যথাসাধ্য প্রবোধ দেবার চেষ্টা করব।

নিখিল। ঠাকুর, আর একটা কথা নিবেদন করি। অজয়ের স্ত্রী বড়ই কাতর হয়েছে। সে যদি একটি বালগোপালের মূর্তি

গড়িয়ে তার সেবা করে, তবে কেমন হয়? সন্তানহারা অনেক স্ত্রী এতে ভুলে থাকে দেখেছি। তাদের ধারণা হয়, শিশুকৃষ্ণের সেই বিগ্রহেই নিজের সন্তান লীন হয়ে আছে।

অজয়। না না নিখিলবাবু, ওসব চলবে না। সুভদ্রার আবার সন্তান হতে পারে, এখনকার শোকও ক্রমশ কমে যাবে, তখন ওই বালগোপাল একটি বোঝা হয়ে পড়বেন, লোকলজ্জায় তাঁকে ফেলাও চলবে না। যন্ত্রণা কমাবার জন্যে এক-আধবার মরফীন দেওয়া চলে, কিন্তু একটা মানুষকে চিরকাল নেশাখোর করে রাখা কি উচিত?

ভবতোষ। অজয়ের কথা খুব ঠিক। নিখিল যা বললে তা ক্ষেত্রবিশেষে চলতে পারে, যেখানে শোক সইবার শক্তি নেই, যুক্তি বোঝবার মতন বুদ্ধি নেই, অন্য সন্তানের সম্ভাবনাও নেই। সুভদ্রার ওপর কোনও ভার চাপানো উচিত নয়। এখন তাকে নানা রকমে অন্যমনস্ক আর প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

নিখিল। আচ্ছা, অজয়ের স্ত্রী যদি মন্ত্র নিয়ে পুজোঅর্চায় মগ্ন হয়ে থাকে তো কেমন হয়?

অজয়। তাতেও আমার আপত্তি আছে। সেদিন এক বনেদী বড়লোকের বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর বৈঠকখানায় তিনটি বড় বড় অয়েল পেণ্টিং আছে, প্রত্যেকটিতে একজন মহিলা সেজেগুজে আসনে বসে পুজো করছেন। সামনে সোনারুপোর হরেক রকম পুজোর বাসন ঝকমক করছে, নানা

উপচার সাজানো রয়েছে, সন্দেশের ওপর পেস্তাটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তাঁদের দৃষ্টি বিগ্রহের দিকে নয়, আগন্তুকের দিকে। যেন বলছেন, সবাই দেখ গো, আমরা পুজো করছি। খোঁজ নিয়ে জানলাম, একটি ছবি গৃহস্বামীর স্ত্রীর, আর দুটি তাঁর স্বর্গতা মা আর ঠাকুমার। এঁদের পুজো একটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল উদ্দেশ্য আড়ম্বর, যেমন আজকালকার সর্বজনীন।

ভবতোষ। সকলেই লোক দেখানো পুজো করে না। সুভদ্রার যদি নিজের আগ্রহ হয় তবে সে মন্ত্র নিয়ে পুজো করুক, কিংবা বিনা আড়ম্বরে উপাসনা করুক, কিন্তু তার জন্যে তাকে হুকুম করা চলবে না। হুজুক থেকেও তাকে বাঁচাতে হবে। কালক্রমে অনেকের নিষ্ঠা কমে যায়, তবু তারা চক্ষুলজ্জায় ঠাট বজায় রাখে। আমি একজনকে জানতুম, তিনি অহিংসার ব্রত নিয়ে নিরামিষাশী হয়েছিলেন। সাধুপুরুষ বলে তাঁর খ্যাতি হল। কিন্তু তিনি লোভ দমন করতে পারেন নি, একদিন হোটেলে লুকিয়ে খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন। নিখাকী মায়েরা বোধ হয় পুণ্যকর্ম ভেবেই উপবাস আরম্ভ করে, কিন্তু লোকের বাহবা শুনে শুনে তাদের কুবুদ্ধি হয়, শেষটায় প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ভক্তি বা নিষ্ঠার অভাব, সন্ধ্যা-আহ্নিক পুজা-অর্চনা না করা, আমিষ ভোজন, কোনওটাই অপরাধ নয়। অনুষ্ঠানহীন নাস্তিকদের মধ্যেও সাধুপুরুষ আছেন। যার ভাল লাগে, সে চিরজীবন একনিষ্ঠ হয়ে অনুষ্ঠান পালন করতে পারে। যদি ভাল না লাগে, তবে যেদিন খুশি

ছেড়ে দিলেও কিছুমাত্র দোষ হয় না। কিন্তু নিষ্ঠা হারিয়ে লোক দেখানো অনুষ্ঠান পালন মহাপাপ। সুভদ্রাকে শান্ত করতে হবে, কিন্তু কোনও রকম বন্ধনে পড়ে তার বুদ্ধি যেন মোহগ্রস্ত না হয়।

অজয়। তবে তাকে জপ আর স্তব করতে বললেন কেন? ইংরিজী প্রবাদ আছে—ঘুম যদি না আসে, তবে ভেড়া গুনতে থাক। জপ আর স্তব করে মনে শান্তি আনাও সেইরকম নয় কি?

ভবতোষ। সেইরকম হলেই বা ক্ষতি কি। ওতে মন শান্ত হবার সম্ভাবনা আছে অথচ বাহ্য আড়ম্বর নেই। নিষ্ঠা না হলে বিনা চক্ষুলজ্জায় যেদিন ইচ্ছে ছেড়ে দেওয়া চলে।

অজয়। আপনি সুভদ্রাকে স্বর্গ পুনর্জন্ম কর্মফল মঙ্গলময় ভগবান—এইসব ছেলে ভুলনো কথা বললেন কেন ঠাকুর? আপনিও কি আধ্যাত্মিক মুষ্টিযোগে বিশ্বাস করেন?

ভবতোষ। দেখ অজয়, তুমি বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যাই হও, একথা মান তো—তুমি আছ, আবার তোমার চাইতে বড়ও একটা কিছু আছে? সেই বড়কে বিশ্বপ্রকৃতি, ব্রহ্ম, অ্যাবসলিউট, মহা অজানা, যা খুশি বলতে পার। সেই বৃহৎ বস্তুর মধ্যে তুমি ডুবে আছ, তা থেকেই তোমার জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ ভালমন্দর উৎপত্তি। এই বস্তু কি রকম তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অতীত, অথচ আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। বিজ্ঞানী দার্শনিক কবি আর ভক্ত সবাই কৌতূহলী,

কিন্তু কেউ স্পষ্ট বুঝতে পারেন না। বিজ্ঞানী আর দার্শনিক শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর যুক্তিসিদ্ধ তথ্য খোঁজেন, যেটুকু জানতে পারেন, তাতেই তুষ্ট হন, শিব বা অশিব, সুন্দর বা বীভৎস কিছুতেই তাঁদের পক্ষপাত নেই। কিন্তু কবি আর ভক্ত প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁরা রস চান, ভাব চান, আনন্দ চান। এজন্য কল্পনা আর রূপকের আশ্রয় নিয়ে মানস বিগ্রহ রচনা করেন, সমগ্র বস্তুর ধারণা করতে না পারলেও খণ্ডে খণ্ডে অনুভব করেন, তবে দৈবাৎ কেউ কেউ পূর্ণানুভূতি পান। মিল্টন আর মধুসূদন পেগান ছিলেন না, তবু তাঁরা অমৃত-ভাষিণী বাগ্‌দেবীর আবাহন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ আর দেশবাসীর ত্রুটি বিলক্ষণ জানতেন, তবু তাঁরা ঐশ্বর্যময়ী মাতৃভূমির বন্দনা করেছেন। Wordsworth বলেছেন—Great God! I would rather be a pagan, suckled in a creed out-worn.. ইত্যাদি। মঙ্গলময় ভগবান না হলে সাধারণ ভক্তের চলে না, কাজেই অমঙ্গলের কারণস্বরূপ তাকে কর্মফল, জন্মান্তর, অরিজিনাল সিন, ফ্রি উইল, শয়তান, কলি ইত্যাদি মানতে হয়। ভক্ত কবি অমঙ্গলের কারণ খোঁজেন না, যেটুকু মঙ্গল পান তাতেই কৃতার্থ হন। তিনি দেখেন—'আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।' তিনি বলেন—'এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য, মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।'

অজয়। আমার উপায় কি হবে ঠাকুর? আমি বিজ্ঞানী নই, দার্শনিক নই, কবি নই, ভক্ত নই, কোনও রকম make-believeএও রুচি নেই।

ভবতোষ। মাথা ঠাণ্ডা করে বুদ্ধি খাটাও, বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ। এদেশের জ্ঞানীরা একদেশদর্শী নন, তাঁরা অত্যন্ত realist, মঙ্গল অমঙ্গল দুই শিরোধার্য করেছেন, বিরোধ মেটাবার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। বলেছেন—ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং; আবার পরেই বলেছেন—গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্। জগতে নিত্য কত লোক মরছে, প্রতি নিমেষে কোটি কোটি জীব ধ্বংস হচ্ছে, কত লোকের সর্বনাশ হচ্ছে, তা দেখেও আমরা বিধাতার দোষ দিই না, অমঙ্গলের কারণ খুঁজি না, জগতের বিধান বলেই মেনে নিয়ে স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে বেড়াই। কিন্তু যেমন নিজে আঘাত পাই অমনি আর্তনাদ করে বলি—ভগবান, এ কি করলে, আমাকে মারলে কেন? গীতায় বিশ্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তা ভয়ংকর, কিন্তু তা ধ্যান করলে মনের ক্ষুদ্রতা কমে। দার্শনিক Santayana লিখেছেন—The truth is cruel, but it can be loved, and it makes free those who have loved it.

অজয়। আপনার কথা ভাল বুঝতে পারছি না ঠাকুর।

ভবতোষ। ক্রমশ বুঝতে পারবে। সকলের দুঃখ বোঝবার

চেষ্টা কর, তোমার দুঃখ কমবে; সকলের সুখে সুখী হও, তোমার সুখ বাড়বে।

অজয় চলে গেল। একটু পরে নিখিল বিদায় নিলেন, তাঁর পিছনে জিতেন আর বিধুও নীচে নেমে এল।

নিখিল বললেন, কি হল জিতেনবাবু, আপনারা বড্ড যেন মুষড়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

জিতেন। আরে ছি ছি, এমন করলে কি প্রতিষ্ঠা হয়, না মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়া যায়? প্রেম, ভক্তি, ভগবানের লীলা এই সবের ব্যাখ্যান করতে হয়, কর্মফল জন্মান্তর পরলোকতত্ত্ব বোঝাতে হয়, কিছু কিছু বিভূতি আর দৈবশক্তি দেখাতে হয়, মিষ্টি মিষ্টি বচন বলতে হয়, তবে না ভক্তরা খুশী হবে! চেতলার গোলোক ঠাকুর সেদিন কি সুন্দর একটি কথা বললেন—'মানুষ কি রকম জানিস? মাছির মা- আর ফানুষের -নুষ। তোরা মাছির মতন আঁস্তাকুড়ে ভনভন করবি, না ফানুষ হয়ে ওপরে উঠবি?' কথাটি শুনে সবাই মোহিত হয়ে গেল। আর আমাদের ঠাকুরটির শুধু কটমটে আবোল-তাবোল বাক্যি, যেন জিওমেট্রি পড়াচ্ছেন। শ্রীপতি রায় ভীষণ রেগে গেছেন, ঠাকুর তাঁকে গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি ধনী মানী লোক, ক্যাডিলাক গাড়িতে এসেছিলেন, তাঁর অপমান করা কি উচিত হয়েছে? আমরা যতই ঠাকুরকে উঁচুতে তোলবার চেষ্টা করছি ততই উনি নেমে যাচ্ছেন।

নিখিল। যা বলেছেন। দেখুন জিতেনবাবু, সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের লেখায় একটি ফারসী বয়েত পড়েছি, তার মানে হচ্ছে—পীর ওড়েন না, তাঁর চেলারাই তাঁকে ওড়ান। ভবতোষ ঠাকুরকে ওড়াবার জন্যে আপনারা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু উনি মাটি কামড়ে আছেন, কিছুতেই উড়বেন না। ওঁর আশা ছেড়ে দিন।

জিতেন। এর চাইতে উনি যদি মৌনী হয়ে থাকতেন কিংবা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতেন, তাও ভাল হত। আমাদের মাঠাকরুনটি অতি বুদ্ধিমতী, তাঁকে ঠাকুরের প্রতিনিধি করে আমরা একটি চমৎকার সংঘ খাড়া করতে পারতুম।

১৩৬০